শ্রীরামকৃষ্ণ মেল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

: পরিবেশক :

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক :
রবীন বল
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ
৺মহালয়া, ১৩৬৩

মুদ্রাকর :
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

শ্রীবঙ্কিম বন্দোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

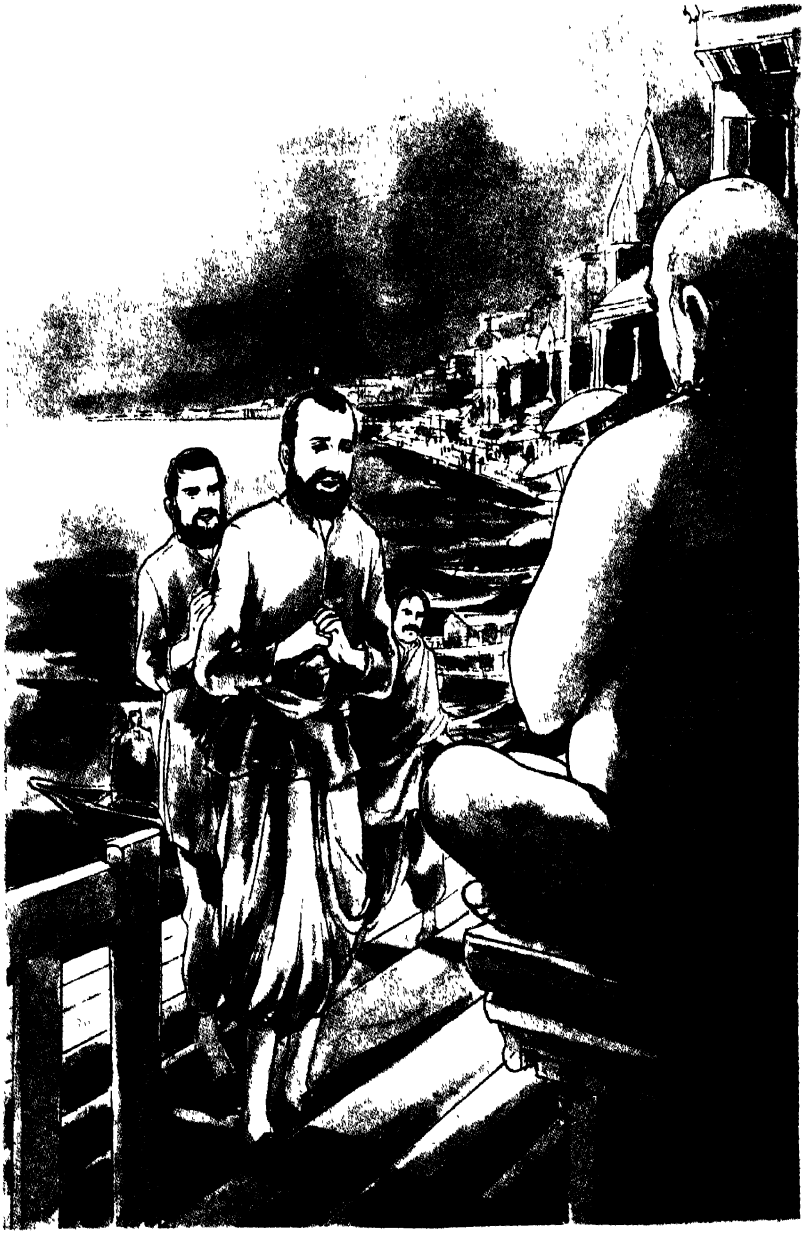

জানুয়ারি মাস। কলকাতায় তখন খুব শীত পড়ত। তখন মানে ১৮৬৮ সাল। কথায় আছে আধা মাঘে কম্বল কাঁধে। তা মাঘ মাসের সাত আট তারিখ। শীত যাই যাই করলেও বেশ কামড় আছে। পশ্চিমে প্রবাহিণী গঙ্গা। উত্তুরে বাতাসে প্রথম সকালে বেশ একটা হিম হিম ভাব। মোলাস্কিনের চাদরটি গায়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে হাসি হাসি মুখে পায়চারি করছেন। মুখ দেখলে মনে হয় সদাসর্বদা আনন্দময় কোনো দৃশ্য যেন দেখছেন। মহাসিন্ধুর ওপার থেকে যেন কোনো বার্তা ভেসে আসছে। সবে কামারপুকুর থেকে ফিরেছেন। দুরূহ সব সাধনা সমাপ্ত। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে জ্যোতির্ময় এক দিব্যপুরুষ ফুরফুরে আনন্দে গাছের আড়ালে আড়ালে ফুলের সমারোহে বিচরণ করছেন। একাকী এক সিংহ।

ফুরফুরে রোদ। বসন্ত যে এসে গেছে। উতলা কোকিল তারস্বরে ডাকছে। শীতে গঙ্গার জল কাঁচের মতো স্বচ্ছ। মাঝি যখন দাঁড় ফেলে দাঁড় তুলছে তখন মনে হচ্ছে তরল কাঁচের আলোড়ন। গাছে গাছে কচি পাতার উদ্ভেদ। সিম সবুজ, হরিৎ সবুজ। পঞ্চবটীর বট, অশ্বত্থ যেন কাঁচা সবুজে স্নান করে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝেই অস্ফুটে বলছেন, কি আনন্দ! কি আনন্দ! কখনো গুনগুন করে গাইছেন, মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে!

কলকে গাছ হলদে ফুলে ছেয়ে গেছে। ঠাকুর একটি ফুল হাতে নিয়ে দেখছেন আর ভাবছেন, সারদা কলকে ফুল বড় ভালবাসে! এমন সময় মথুরবাবু এলেন। ফিটন থেকে নেমেই, বাবা কোথায়, বাবা কোথায়, বলতে বলতে সোজা পঞ্চবটীতে। জানতেন, এই সময় এইখানেই থাকবেন তিনি। প্রকৃতি যে তাঁর সঙ্গে কথা বলে! পাখির ভাষা তিনি বোঝেন। বাতাস তাঁর কানে কানে কথা কয়। পাশের বারুদ কোম্পানি যখন এই পঞ্চবটী অধিকার করতে চেয়েছিল বাবা জগদম্বাকে বলেছিলেন, মা, আমার পঞ্চবটী চলে গেলে কোথায় সাধন করব! মথুরবাবু মামলা জুড়লেন, মাইকেল মধুসূদন ডাটকে ব্যারিস্টার দিলেন। মামলা জিতলেন মথুরামোহন।

মথুরবাবু এখনো শাল ছাড়েন নি। দামী কাজ করা শাল। এর জোড়াটি বাবাকে দিয়েছিলেন। প্রথমে সাগ্রহে বালকের আনন্দে

গায়ে দিলেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। পরমুহূর্তেই উন্মাদ। মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে ঠাসছেন আর বলছেন, দূর শালার শাল। মথুরবাবু তাড়াতাড়ি উদ্ধার করলেন, করো কি, করো কি! পাঁচ হাজার টাকা দাম!

মথুরবাবুর পরিধানে ফরাসডাঙ্গার মিহি ধুতি। বাহান্ন ইঞ্চি বহর। সামনে লোটাচ্ছে কোঁচা। বার্নিস করা কালো ঝকঝকে জুতো। সাজতে ভালবাসেন। রজোগুণী মানুষ। বিশাল ব্যক্তিত্ব। কেউ মুখ তুলে কথা বলতে সাহস পায় না; কিন্তু বাবার কাছে কেঁচো।

ঠাকুর একটু আগে মৃদু মৃদু হাততালি দিচ্ছিলেন। তালির শব্দে দেহবৃক্ষের পাপ পাখি উড়ে যায়। তালি থামিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার! এত সকালে তুমি?'

'ওই যে জগদম্বা বললে, তুমি এক্ষুণি গিয়ে বাবাকে ধরো।'

'তোমরা ত ধরেই আছ, নতুন করে আর কি ধরবে!'

'আমাদের সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে।'

'যাচ্ছ কোথায়?'

'কাশীতে, বাবা বিশ্বনাথের কাছে।'

'বাবার কাছে! রানী এই পর্যন্ত এসে মায়ের কাছে নোঙর ফেলেছিল, আমরা সেই নোঙর তুলব?'

'তখন রেল ছিল না, এখন লাইন পেতেছে। আমরা রেলে যাব।'

'তা চলো। তাড়াতাড়ি চলো।'

ঠাকুরের চোখে ঘোর নামছে। মথুর বুঝতে পারছেন, বাবা এখনি এই মুহূর্তে কাশী চলে যাবেন। বিষয়ের কথায় টেনে ধরে রাখতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি বললেন, 'ব্যবস্থাটা কি রকম করেছি শোনো। রেল কোম্পানির কাছ থেকে চারখানা বগি একেবারে রিজার্ভ করে নিয়েছি আমাদের জন্যে।'

ঠাকুর বললেন, 'চলো, চলো, বেদীতে বসে শুনি।' তারপর মথুরের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, 'তুমি কি বসতে পারবে! তোমার যা সাজপোশাক!'

মথুর বললেন, 'তুমি যেখানে স্বর্গ সেখানে। তোমার স্পর্শে

ধুলোও সোনা হয়ে যায়।'

দুজনে বেশ আয়েস করে বেদীতে বসলেন গঙ্গার দিকে মুখ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাঁ পাটি ঝুলছে। ভাঁজ করা ডান পা বেদীতে। ডান হাতটি পড়ে আছে হাঁটুর ওপর। মথুরের দিকে তাকিয়ে আছেন গভীর আগ্রহে।

মথুরবাবু বলছেন, 'দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা বগি, তৃতীয় শ্রেণীর তিনটে। চারটে কোচ থাকবে একেবারে শেষের দিকে। যে স্টেশানে বলব, সেইখানেই কেটে রেখে দেবে। আমরা ঘুরব ফিরব। বললেই আবার জুড়ে দেবে ইঞ্জিনের সঙ্গে।'

'এরকম করলে কেন?'

'বাবা, বেরচ্ছি যখন, তখন কি আমরা শুধু কাশীতেই যাব! আমরা বৈদ্যনাথধামে যাব। একবার প্রয়াগে যাব।'

ঠাকুর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'পইরাগ! পইরাগে যাবে!'

'আরও যাব, আরো দূরে। বৃন্দাবন।'

ঠাকুরের চোখে ভাবাশ্রু। ধরা ধরা গলায় বললেন, 'যেখানে আজও বাজায় বাঁশি শ্যামসুন্দর। সেই গিরিগোবর্ধন! তাহলে সব গোছগাছ করে ফেলি। আমার গামছা, গাড়ু, বটুয়া।'

মথুর বললেন, 'তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। সব করবে তোমার জগদম্বা।'

'তাহলে আমরা রেলে চাপছি কবে?'

'সাতাশ জানুয়ারি। আর ঠিক সাতদিন পরে।'

'তাহলে মাকে একবার বলে আসি। কি বলো?'

'অবশ্যই। মায়ের অনুমতি ছাড়া তুমি কবে কি করেছ বলো। মা অনুমতি দেবেন। আমার সঙ্গে যাচ্ছ যে। কি মজা হবে! জানলার ধারে আমার পাশটিতে বসে থাকবে। রেল ছুটবে হুহু করে। ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ। মাঝে মাঝে ভোঁ। জঙ্গল, পাহাড়, নদী। তারপর তোমার সবচেয়ে প্রিয় নদী হর, হর, গঙ্গা।'

'মাঝে মাঝে একটু একটু খাওয়া।'

মথুরবাবু হাসছেন।

ঠাকুর বলছেন, 'হ্যাঁ গো, রেলে চাপলেই দেখবে, কেবল মনে

হবে, এটা খাই, ওটা খাই।'

মথুরবাবু কুঠি বাড়ির দিকে যেতে যেতে বললেন, 'বাবা! ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে। সাবধান! শরীরটা ঠিক রেখ। আর মাত্র সাত দিন। যাচ্ছি শেষ শীতে, ফিরব সেই গ্রীষ্মে। অনেক দিন।'

॥ দুই ॥

রাতের বেলা ঠাকুর হৃদয়কে বলছেন, 'শোন, প্রশ্ন করেছিলুম মাকে, মা তীর্থে কেন যাব?'

ঠাকুর মশারির ভেতর, হৃদয় মশারির বাইরে। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় দেয়ালে বড় বড় ছায়া। বাইরে রাতের অন্ধকারে বাতাসের পায়চারি। শীত চলে যাওয়ার মুখে মশার উপদ্রব বাড়ে। ধুনোর ধোঁয়ায় একটু কমেছিল, এখন কোণে কোণে কীর্তন। হৃদয় চড় চাপড় মারছিলেন। শব্দ থামিয়ে, সংযত হয়ে বললেন, 'মা কি বললেন?'

মা বললেন, 'যেখানে অনেক লোকে অনেক দিন ধরে ঈশ্বর দর্শন করবে বলে তপজপ, ধ্যানধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেচে সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে জানবি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে। তাই সেখানে সহজেই উদ্দীপন হয়, তাঁর দর্শন হয়। যুগ যুগ ধরে কত সাধু-ভক্ত-সিদ্ধ পুরুষেরা এইসব স্থানে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেচে, অন্য সব বাসনা কামনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেচে, সেজন্যে ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এইসব জায়গায় তাঁর বিশেষ প্রকাশ। যেমন মাটি খুঁড়লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাতকো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে সেখানে জলের জন্যে আর খুঁড়তে হয় না, যখনই ইচ্ছা জল পাওয়া যায়, তেমনি।'

হৃদয় নিজের মশারি গুঁজতে গুঁজতে বললেন, 'কদিন একটু সাবধানে থাকার চেষ্টা কর, মাঝরাতে অমন হুটহাট করে মায়ের খোঁজে পঞ্চবটীতে চলে যেও না। শীত শেষ হতে চলেছে, এখন তেনারা সব ঘুম ভেঙে শিকারের সন্ধানে বেরোবেন।'

'কাদের কথা বলছিস?'

'সাপ।'

'সাপ আমার কি করবে! ওই জঙ্গলে সবাই আমার বন্ধু।'

'বুঝবে, যেদিন ন্যাজে পা পড়বে! বন্ধুর শত্রু হতে এক মিনিটও সময় লাগবে না।'

হৃদয় চাদর মুড়ি দিয়ে বেশ গুছিয়ে শুয়ে পড়লেন। আলো নেবান ঘরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। গোটাকতক আগুনের ফুলকি ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুটো এসে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের মশারির চালে। শীতল অগ্নি। এ আগুনে আগুন লাগে না। ঠাকুর জোনাকি ভালবাসেন। যেন আত্মার উড়ন্ত স্ফুলিঙ্গ! বিছানায় বসে বসে অবাক হয়ে দেখছেন। মহামায়ার মায়ার খেলা—সুন্দরে, কুৎসিতে, বিশালে, ক্ষুদ্রে জগৎটাকে কেমন সাজিয়েছেন!

অস্ফুটে কয়েকবার বললেন, কাশী, কাশী। কানের কাছে ঝঙ্কৃত হল শঙ্কর-স্তোত্র,

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ, সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা॥

শোনো, শোনো, এখানে এলে মানুষের চিত্তে বিষয়বাসনা থাকে না। পরমা শান্তি পেতে চাও? চলে এস এইখানে। তীর্থশ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা এইখানে। জ্ঞানের প্রবাহস্বরূপ বিমল আদিগঙ্গা এই-খানেই প্রবাহিত। আমি স্বয়ং সেই বোধরূপিণী কাশীস্বরূপ।

চারপাশ থেকে জোনাকির চমকিত আলো ঠাকুরের ভাবময় মুখের ওপর এসে পড়ছে। ঠাকুর বসে আছেন। কথা কইছেন শঙ্করাচার্যের সঙ্গে। 'ঠিকই তো! বোধরূপিণী কাশীস্বরূপ। কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্বপ্রকাশিকা। কা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা॥ জ্ঞানের দ্বারাই কাশী প্রকাশিত হয়, আর জ্ঞানরূপিণী কাশী সকলকে প্রকাশিত করে। জ্ঞানকাশীকে জানলে তবেই কাশীলাভ হয়। রানীর ত তাই হল মথুর! মা দেখিয়ে দিলেন, এই দক্ষিণেশ্বরে আমার প্রকাশ এইখানেই আছে তোমার কাশী। মথুরকে শোনাতে হবে, শোনো মথুর, শঙ্কর কি বলছেন,

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা,
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোহঃ তুরীয়ঃ সকলজনমনঃ সাক্ষীভূতঃ অন্তরাত্মা,
দেহে সর্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি॥

মানুষের দেহই কাশীক্ষেত্র, জ্ঞানই ত্রিভুবনজননী ও সর্বব্যাপিনী গঙ্গাস্বরূপা, ভক্তি আর শ্রদ্ধাই হল পয়া, নিজের গুরুর চরণধ্যানই প্রয়াগ আর সকল মানুষের মনঃসাক্ষীভূত তুরীয় ব্রহ্মই বিশ্বেশ্বর। আমার দেহেই ত সব রয়েছে! তাহলে'—হঠাৎ গান এসে গেল, 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চি কেবা চায় / কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়!' হৃদয় বিছানায় উঠে বসে বললেন, 'তোমার না হয় ঘুম নেই, আমাদের-ত একটু ঘুমোতে দেবে! সারাটা দিন খেটে খেটে মরি!' হৃদয়ের কথা কানেই গেল না।

॥ তিন ॥

মথুরবাবু স্টেশানে এলেন। সে এক মহা মিছিল। শ দেড়েক মানুষ। মাল-পত্তর, হই-হট্টগোল। এস্টেটের কর্মচারীদের অতি তৎপরতা। আসা-শোঁটা। ভাঁজ করা রুপোর ছাতা। সুবেশধারী আত্মীয়স্বজন, মথুরবাবুর গুরুপুত্ররা। ঝকঝকে ট্রেন! লোহার ইঞ্জিন সর্বাঙ্গ দিয়ে বাষ্প ছড়াচ্ছে। গনগনে আগুনে কয়লা ঠেলছে খালাসি। উর্দিপরা অ্যাংলো ড্রাইভার লাল মুখে বাইরে তাকিয়ে। রাজকীয় এই সমারোহ দেখছেন। বারে বারে তাঁর চোখ চলে যাচ্ছে একটি মানুষের পানে। তিনি যেন হাঁসের মধ্যে রাজহাঁস।

মথুরবাবু তাঁর বাবাকে আগলে রেখেছেন একেবারে পাশটিতে। দক্ষিণেশ্বরের মা কালীকে যেন নিয়ে চলেছেন, কাশীর বিশ্বনাথের কাছে। রামকৃষ্ণই ত তাঁর কালী। এ দর্শন ত তাঁর হয়েছে। সে-কৃপা বাবা তাঁকে করেছেন। ঠাকুর তাঁর ঘরের উত্তরপূর্ব কোণের প্রশস্ত বারান্দায় গোঁভরে পায়চারি করছেন আর মথুরবাবু তাঁর কুঠিবাড়ির একটি ঘরে বসে ঠাকুরকে লক্ষ্য করছেন। হঠাৎ এ কী দর্শন! এ তো শ্রীরামকৃষ্ণ নয়! চোখ রগড়ালেন। না, কোনো ভুল নেই! সেই একই দর্শন! অভিভূত, আত্মহারা মথুরামোহন সম্পূর্ণ বিস্মৃত, যে তিনি জানবাজারের জমিদার, রানী রাসমণির জামাতা। ছুটে গিয়ে পড়লেন বাবার পায়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বিৎ ফিরে এল, পদপ্রান্তে এ কে! সেজবাবু! ঠাকুর বলছেন—'এ কি, এ কি! তুমি এ কি করছ মথুর! তুমি বাবু, রানীর জামাই, তোমায় এমন করতে দেখলে লোকে কী বলবে! স্থির হও, ওঠ!' অনেক কষ্টে নিজেকে

সংযত করে মথুরামোহন বললেন, 'বাবা, তুমি বেড়াচ্চ আর আমি দেখছি, যখন এদিকে এগিয়ে আসচ, তুমি নও, আমার ওই মন্দিরের মা! যেই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ, সাক্ষাৎ মহাদেব! তুমিই শিব, তুমিই কালী!'

বিশ্বনাথকে নিয়ে বিশ্বনাথ দর্শনে চলেছেন মথুরামোহন। গার্ড সায়েব পতাকা নেড়ে, হুইসিল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলেন। ঠাকুর বসেছেন জানলার ধারটিতে। একপাশে হৃদয়। বিপরীত দিকে মথুরামোহন। কলকাতা ক্রমশই পেছচ্ছে। নতুন গ্রাম, জনপদ, বনানী সব ঘুরপাক খেতে খেতে ছিটকে চলে যাচ্ছে পেছন দিকে! মনে মনে ভাবছেন ঠাকুর, বিশ্বনাথের দিকে যত এগোচ্ছি বর্তমান জগৎ ততই কেমন পেছনে সরে সরে যাচ্ছে। এ জগৎ না পালালে ও জগৎ কাছে আসবে কি করে! এদিক যাবে তবে ত ওদিক আসবে! সূর্য গেলে আসবে চাঁদ। সূর্য এলে চাঁদ পালাবে।

ঠাকুরকে সাবধান করছেন মথুরামোহন, 'বাবা। মিটি মিটি চাও, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়লে কষ্ট হবে। তুমি বরং আমার জায়গাটায় এস, আমি ওই দিকটায় যাই।'

ঠাকুর স্নেহমাখান গলায় বললেন, 'না গো সেজবাবু। তোমার চোখে পড়া মানেই আমার চোখে পড়া! এতকাল চোখে কালী পড়েছে, এবার না হয় কয়লাই পড়ুক।'

ঠাকুর আনন্দে গান ধরলেন,

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যাঁর নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তাঁর কোন কালরূপ হল॥
কালরূপ অনেক আছে, এ-বড় আশ্চর্য কালো।
যারে হৃদিমাঝে রাখলে পরে হৃদপদ্ম করে আলো॥

রেলের ছুটন্ত চাকার দুরন্ত শব্দ, বাতাসের ফন ফন, ঠাকুরের গান। কামরার বিশিষ্ট যাত্রীরা অভিভূত। হাঁ, একেই বলে তীর্থ-যাত্রা। যার মনে যতটুকু বিষয় লেগেছিল সব ঝরে ঝরে পড়ে যেতে লাগল।

ট্রেন যশিডিতে এল। স্টেশানের কাছের পাহাড়টি দেখে ঠাকুরের কি আনন্দ! সমতলের মানুষ পাহাড় দর্শনে উদ্দীপন। মথুরা-মোহন দলবল নিয়ে নামলেন। পূর্বের ব্যবস্থা মতো সার সার টাঙ্গা

লেগে গেল। কঙ্কালসার ঘোড়া। ঠাকুর রহস্য করে বললেন, 'ও মথুর! এখানেও যে বেলী শা!'

বরাহনগরে বেলী শার আস্তাবল থেকে ঠাকুরের জন্যে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করার ব্যবস্থা মথুরবাবু চালু করেছিলেন। যখন খুশি ঠাকুর কলকাতার ভক্তদের বাড়ি যাবেন। সেখানেও ওই একই ঘোড়া। জরাজীর্ণ।

মথুরবাবু বললেন, 'বাবা ভয় নেই। ঘোড়া যখন অভ্যাসই দৌড়বে। এখানে একটাই ভয় মাঝে মাঝে চাকা খুলে যায়।'

ঠাকুর মহা উৎসাহে বললেন, 'সে ওখানেও খোলে গো!'

'তা হলে বলতে হয় গাড়ি যখন চাকা ত খুলবেই।'

সার সার টাঙ্গা বৈদ্যনাথধামের দিকে ছুটল। পথের মোরামে লোহার চাকার মচমচ শব্দ। যে গাড়িতে সস্ত্রীক মথুরবাবু সেই গাড়িতেই ঠাকুর। মথুরবাবু বাবাকে কাছ ছাড়া করবেন না। এই অলৌকিক বালকটি কখন কি করে বসেন তার ঠিক নেই। জড়িয়ে ধরে আছেন। টাঙ্গায় টাঙ্গায় গতির প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এদের এই স্বভাব। মথুরবাবুর টাঙ্গার চালকের মহা উৎসাহ। ক্ষোদ মালিক তার সওয়ারি। তাকে ত সবার আগে যেতে হবেই।

মথুরবাবু যত বারণ করেন, ঠাকুর ততই উৎসাহ দেন, 'চালাও, চালাও।'

এইসব অঞ্চলে বাঙালিবাবুরা শীতে বায়ু পরিবর্তনে আসেন। সুন্দর সুন্দর বাগান বাড়ি। গোলাপ বাগিচা। গোলাপের জন্যে বিখ্যাত এই সাঁওতাল পরগণা। ঠাকুর উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'তোমরা আমাকে কত আনন্দই দিচ্ছ মথুর।'

মথুর বললেন, 'আমরা দিচ্ছি, না তুমি আমাদের আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছ!'

মথুরবাবুর সব ব্যবস্থাই সুন্দর। বিশাল বাড়িটি মুহূর্তে শত মানুষে জমজমাট। ঠাকুরের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে নির্জন, নিরিবিলি একটি কোণের ঘর। জানালায় দাঁড়ালেই বৈজনাথজীর মন্দিরের চূড়াটি চোখে পড়ে। হৃদয় বলছেন, 'তুমি এত অস্থির হয়েছ কেন? উঠছ, বসছ, ছুটে ছুটে যাচ্ছ জানলার কাছে।...'

ঠাকুর বললেন, 'সেজবাবুকে বল না, মন্দিরে গিয়ে শৃঙ্গার

আরতি দেখে আসি।'

'সে হবে'খন। এখন একটু বিশ্রাম করো।'

'শ্রম হল কই যে বিশ্রাম!'

বলতে বলতেই মথুরামোহন এলেন, 'কী হল, ছটফট! ফর্সিতে সবে দুটান দিয়েছি, মনে হল হৃদয়ে হৃদয় লাফাচ্ছে। তখনই বুঝলুম, বাবা চঞ্চল। চলো মন্দিরে। বাবাকে হাজিরা দিয়ে আসি।'

প্যাঁড়া গলিতে প্রবেশ মাত্রই ঠাকুরের ভাবান্তর। মন্দিরের দশাসই এক সেবক, হাতে তাঁর বিশাল এক পেতলের সাজি, ঝড়ের বেগে গলিতে গলিতে ছুটছেন, শিবকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ছেন, ভোলে ব্যোম। যে যা পারছেন তুলে দিচ্ছেন তাঁর সাজিতে ঝটপট। মন্দিরে বাদ্যবাজনা শুরু হয়ে গেছে। ঠাকুরের সহাস্য মুখ অন্তরঙ্গ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। মনে মনে বলছেন, 'বাবা, তোমার কীর্তি ত জানা আছে!' এত সাজগোজ, এত খাতির, এরপরেই ত শ্মশান শয্যা! ছাই ভস্ম, মড়ার মাথা! আমার মা-টি না থাকলে, বাবা, তোমার কি হত! যখন খুব বাড়াবাড়ি করে ফেল, তখন মা বাধ্য হয়ে তোমাকে পায়ে চেপে রাখেন। আমরা সেই দৃশ্য দেখে ফেলি বলে, মা লজ্জায় জিভ কাটেন! সে আর কি হবে বল, একমাত্র আমার মা-ই জানেন তোমার শাসন! তোমার অনুশাসনে যত জীব, আর আমার মায়ের শাসনে সাক্ষাৎ শিব!'

ঠাকুর খিল খিল করে হাসছেন। সে হাসি যুক্ত হল আরতির ডমরু, ঘণ্টার ঐকবাদ্যে। কর্পূরের অগ্নিশিখা মন্দির কন্দরে নৃত্যের তালে নাচছে। অজস্র ঘৃতপ্রদীপের শিখায় উদ্ভাসিত অলৌকিক পরিবেশ। ধীরে ধীরে ঠাকুর সমাধিতে প্রবেশ করলেন। মন্দিরের দুয়ার এবার বন্ধ হবে। সবাই দেখছেন, জ্যোতির্ময় এক দিব্যপুরুষ রাজকীয় এক মানুষের কাঁধে ভর রেখে মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে আসছেন। কেউ বলছে, বহুত পিয়া। এক বিশালকায় সন্ন্যাসী পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'পিলে, পিলে হরিনামকা পেয়ালা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বালগোপালের মতো হাসতে হাসতে, আবদারের গলায় বললেন, 'ও সেজবাবু! আমি একটা প্যাঁড়া খাব।' ঠাকুরের

যখন এই ভাবটি হয়, বালক-ভাব, মথুরামোহনের তখন আনন্দের সীমা, পরিসীমা থাকে না। তখন তিনি অবতারের পিতা, যেন বসুদেব! এমন আবদারে প্যাঁড়া কেন, রাজত্বও দিয়ে দেওয়া যায়। মথুরামোহন প্যাঁড়ার দোকানে গেলেন।

পরের দিন, সকাল যেমন হয় তেমনই হল। বিদায়ী শীতের ভব্য সূর্য, নরম তাপে নেমে এল কাঁকুরে, কিঞ্চিৎ রুক্ষ প্রকৃতিতে। গোলাপে সেজেছে উদ্যান, গাঁদার ঢল নেমেছে। শ্বেত টগর। বাগান বিলাস লালে লাল। ঠাকুর হাততালি দিয়ে হরি নাম করছেন। হৃদয় হিসেব করছেন, এ-যাত্রায় মথুরামোহনের কত খরচ হতে পারে। ঠাকুর মাঝে মাঝে আক্ষেপ করেন, এত করেও বিষয় তোকে ছাড়ছে না রে হৃদয়!

মথুরবাবু বললেন, 'চলো বাবা, গ্রামে ঘুরে আসি।'

এখানেও জানবাজারের সম্পত্তি! কত কি যে করে ফেলেছে মথুর। বিষয় এমন জিনিস, বাড়ালেই বাড়ে। ম্যালোরিয়ার জ্বরের মতো। কাঁপতে কাঁপতে আসে, ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। দেহাতি গ্রামের করুণ অবস্থা দেখে ঠাকুর একটি গাছতলায় বসে পড়লেন। হতদরিদ্র মানুষ সব। হাড়ের খাঁচা। মাথাগুলো সব তালের আঁটির মতো। চুলে কতকাল তেল পড়েনি। পরনে ট্যানা। পেট-গুলো সব পিঠের সঙ্গে ঠেকে গেছে। প্রতিটি পাঁজরা গুনে নেওয়া যায়। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ঠাকুরের চোখে জল আসছে। ইশারায় কাছে ডাকলেন মথুরামোহনকে। ভাল করে কথা বলতে পারছেন না,

'মথুর এসব কি! এ কী দীনহীন অবস্থা!'

বাবার এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মথুর পরিচিত। এ এক অন্য কণ্ঠ-স্বর, অন্য রামকৃষ্ণ, অন্য ব্যক্তিত্ব, যার সামনে জাঁদরেল জমিদার মথুরামোহনও থতমত খেয়ে যান। জানবাজারি অহঙ্কার গুঁড়ো হয়ে যায়। এ তাঁর ইষ্টের কণ্ঠস্বর। মথুরামোহন আমতা আমতা করে বললেন, 'বাবা, এরা যে খুব গরিব!'

রামকৃষ্ণ উঠে পড়েছেন। বসে থাকতে পারলেন না। প্রশ্ন করলেন, 'কেন গরিব!'

মথুরামোহন জবাব খুঁজে পেলেন না। কেন কিছু মানুষ

গরিব, কিছু মানুষ বিপুল ধনী, তিনি কি করে বলবেন! অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছেন ঠাকুরের সামনে।

রামকৃষ্ণ মথুরামোহনের হাত দুটি ধরলেন। তাঁর চোখে জল, 'তুমি তো মা-র দেওয়ান মথুর! তুমি পার না, এদের এক মাথা করে তেল, আর একখানা করে কাপড় দিতে, আর পেট ভরে এক-দিন খাইয়ে দিতে!'

মথুরামোহনের হাত দুটো শক্ত করে ধরে আছেন রামকৃষ্ণ। মথুরামোহনের ওপর স্থির দৃষ্টি। তিনি কদাচিৎ পুরোপুরি চোখ খোলেন। এখন খুলেছেন। মথুর বিস্মিত। যেন জল টলটলে অতল দুটি হ্রদ দেখছেন। এত প্রেম! এত করুণা! তবু মথুরা-মোহন একটু পেছপাও হলেন, 'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, তা ছাড়া এত লোক, এদের খাওয়াতে দাওয়াতে গেলে অনেক টাকা লাগবে। টাকার অনটন হয়ে যেতে পারে বাবা!'

রামকৃষ্ণ এক ঝটকায় মথুরামোহনের হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেলেন সেই লোকগুলির দঙ্গলে। তাদের মাঝে থেবড়ে বসে উগ্র কণ্ঠে বললেন, 'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না। তোমার দলবল নিয়ে তুমি চলে যাও মথুরামোহন। এই আমার কাশী।'

ওই যে শঙ্করাচার্য লিখেছেন, 'পাপরাশিক্রমাক্রান্তা যে দারিদ্র্য-পরাজিতাঃ যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসীগতিঃ। রাশি রাশি পাতকে আক্রান্ত, দারিদ্র্য কর্তৃক পরাভূত, কোথাও যাদের গতি নেই, বারাণসীই তাদের গতি। তা মাঠের মাঝে তারাই ত বসে আছে যাদের গতি বারাণসী। তুমি যাও মথুর তোমার বারাণসীতে, আমার বারাণসী আমি পেয়ে গেছি।

মথুরবাবু হাত ধরে ঠাকুরকে তুললেন, 'ওঠো। সব ব্যবস্থা করছি। তোমার আদেশ মায়ের আদেশ। তুমিই আমার বিশ্বেশ্বর, তুমিই আমার বীরেশ্বর, তুমিই আমার বিবেকের কণ্ঠস্বর।' এইবার মথুরবাবুর চোখে জল। বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী শাস্ত্রপ্রমাণে সাধে কি এঁকে অবতার বলেছেন! প্রেমাবতার।

মথুরবাবুর নায়েব ছুটলেন কেনাকাটায়। এল মাথায় মাখার নারকোল তেল, গাঁট গাঁট কাপড়, চাল, ডাল, তরিতরকারি। পরের

পরের দিন সে এক মহাসমারোহ! সবাই দেখছেন, দরিদ্র জীব, ঠাকুর দেখছেন, পবিত্র শিব। সকলের মাথায় তেল পড়েছে। রোদ পড়ে মুখ চকচক করছে। সকলের পরনে নতুন বস্ত্র। কোরা কাপড়ের গন্ধ। পাতে পাতে গরম খিচুড়ি ধোঁয়া ছাড়ছে। হাতা হাতা তরকারি। লাড্ডুর পাহাড় একপাশে অপেক্ষা করছে, একটু পরেই পাতে পাতে পড়বে। গাছের ছায়ায় মাঠভর্তি লোক। মাথা হেঁট করে সুপ সাপ খেয়ে চলেছে। কত দিন পরে তাদের এই পেটপুরে সুখাদ্য ভোজন! রামকৃষ্ণ হাতদুটি জোড় করে তাদের মাঝে মহানন্দে ঘুরছেন। অশ্রুসজল চোখ। মাঝে মাঝে করতালি দিয়ে বলছেন, খাও, খাও, বাবারা খাও, খুব খাও, খুব খাও। যারা আহারে বসেছে, যারা বসার অপেক্ষায়, তারা মনে মনে বলছে; 'তু কে বটে! তুই কে? ভগবান!'

অদূরে মথুরামোহন নিজে তদারকি করছেন। কর্মচারিদের আদেশ করছেন, 'যে যত পারে দিয়ে যাও। ফুরিয়ে গেলে আবার চাপাও। আমি মায়ের দেওয়ান। আমার দক্ষিণেশ্বরের বাবা বিশ্বনাথ, ওই দেখ পাতে পাতে লাড্ডু পরিবেশন করছে। এই অজানা প্রান্তরে আজ জীব আর শিব একসঙ্গে হাসছেন। যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। চাপাও হাঁড়ি, আমার বাবা আজ শতমুখে আহার করছেন। লাগে টাকা দেবে মথুরামোহন।'

সূর্য নামল পশ্চিমে। দূর আকাশে ত্রিকূটের ছবি আরো গাঢ় হল। আকাশের রঙ হয়ে এল ধূসর নীল। গ্রামের মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে গেল গ্রামে। কেউই জবাব পায়নি তাদের প্রশ্নের—কে বটে তু! এক বালক বলেছিল, ভগবান বটে! হতে পারে! গল্পে আছে, জীবের দুঃখে বৈকুণ্ঠের ভগবান মানুষের ভগবান হয়ে নেমে আসেন!

সাইডিং থেকে লাইনে এল চারখানা কোচ, জুড়ে গেছে ইঞ্জিন। গার্ড সায়েব বাজাও বাঁশি, নাড়াও পতাকা। ওই দেখ, যায় চলে 'রামকৃষ্ণ মেল' ইতিহাসের লাইন ধরে।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের পানসি ॥

'বাবা! তুমি সন্তুষ্ট তো! কেমন হল বলো! এক মাঠ লোক হুসহাস করে খিচুড়ি খেল। পরনে নতুন কাপড়, তেল চুকচুকে চুল। আমার ভীষণ ভাল লাগল বাবা। ভেতরটা যেন ভরে গেল।'

ট্রেন ছুটছে হুহু করে মেন লাইন ধরে। জমিদার মথুরামোহনের বিশেষ চারটি বগি যশিডি থেকে জুড়ে গেছে। জানলার ধারে মুখোমুখি আসনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর মথুরামোহন। ঠাকুরের মুখ রোদের আভায় সোনার মতো উজ্জ্বল। সাধন-ভজন ও সিদ্ধি-লাভে তিনি দিব্যকান্তি হয়েছেন। মথুরামোহন কথা বলছেন আর তাঁর বড় আদরের বাবাকে দেখছেন। রানীমায়ের কালীবাড়ির সেই অতীতদিনের নানা স্মৃতি জেগে উঠছে মথুরামোহনের মনে। সেই সময় কিছু কিছু কথা, কোনো কোনো আদেশের মধ্যে বড়লোকের অহংকার হয়ত ছিল। তখনও যে বোঝা যায়নি, কৃপা করে মা জগদম্বা কাকে ডেকে এনেছেন! কে জাগাবেন পাথরপ্রতিমাকে। কার কাছে দিগ্বিদিক থেকে ছুটে আসবেন সাধু, সন্ত, পণ্ডিত, সজ্জন! কে তখন জেনেছিল, দক্ষিণেশ্বর হবে মহাতীর্থ! মথুরা-মোহনের মনে হল, অতীতে কখনো কোনো অসম্মান করে ফেলিনি ত!

হঠাৎ ঠাকুরের হাঁটু দুটো দুহাতে স্পর্শ করে, জমিদার দীনাতিদীনের মতো বললেন, 'বাবা, ক্ষমা করো।'

ঠাকুরের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল। চলমান প্রকৃতিতে মগ্ন হয়ে একটি গান গুনগুন করছিলেন। মথুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাঝে মাঝে অপরাধ করা ভাল তাহলে চাইতে পারবে বিষয় সম্পত্তি মান সম্মানের চেয়েও মূল্যবান সামান্য একটি জিনিস, সেটা হল ক্ষমা। তুমি অহংকারের কথা ভাবছিলে ত! তা শোনো, অহংকার কি রকম জান? যেমন পদ্মের পাপড়ি ও নারকেল সুপারির বাল্‌তা খসে গেলেও সেস্থানে একটা দাগ থাকে; তেমনি অহংকার গেলে তাতে একটু দাগের চিহ্ন থাকেই থাকে। তবে সে অহংকারে কারও কিছু অনিষ্ট করতে পারে না। তার দ্বারা খাওয়া-দাওয়া, শোয়া ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোনো কর্ম চলে না।'

মথুর বললেন, 'জমিদারির কাজকর্মে ক্ষতিকারক অহংকার যে আসবেই!'

'আসুক। সতের রাগ কি রকম জান? যেমন জলের দাগ; জলে একটা দাগ দিলে তখনই যেমন আবার মিলিয়ে যায়, তেমনি সতের রাগ হয় আর তখনি থেমে যায়। তুমি অত সব ভেবে অস্থির হচ্ছ কেন, যা করছ যেমন ভাবে করছ করে যাও। জমিদারের জমিদারি চালাতে হলে লেঠেলও রাখতে হয়। শোনো মথুরবাবু, দুই রকম 'আমি' আছে—একটা পাকা 'আমি' আর একটা কাঁচা। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে—এগুলো কাঁচা আমি; আর পাকা 'আমি' হচ্ছে—আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ।'

একটা স্টেশানে গাড়ি থামল। দু-চারজন যাত্রী মাল-পত্র মাথায় জানলার পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল। একজনের মাথায় বিশাল পাগড়ি, কাঁধে একটা লাঠি। লাঠির আগায় একটা পুঁটলি। ঠাকুর মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন। যাত্রীটির কোনো তাড়া নেই। নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে দূরে চলে গেল। পায়ে নাগরা জুতো। বহু পথ চলায় বিধ্বস্ত। যতক্ষণ দেখা যায় মোহিত হয়ে লোকটিকে দেখলেন ঠাকুর। মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেখছে অমন করে!'

ভাবস্থ ঠাকুর বললেন, 'মানুষ। মানুষ দেখছি গো। মানুষ—যেমন বালিশের খোল। বালিশের ওপর দেখতে কোনটা লাল, কোনটা কালো; কিন্তু সকলের ভেতরে সেই একই তুলো। মানুষ দেখতে কেউ সুন্দর, কেউ কালো, কেউ সাধু, কেউ অসাধু; কিন্তু সকলের ভেতর সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করছেন।'

মথুরবাবু বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'বাবা, ওই ভাবটি ধরে রাখা কি সহজ কথা!'

ঠাকুর বললেন, 'তা যা বলেছ! তাক তেরে কেটে তাক বোল মুখে বলা সহজ হাতে বাজানো কঠিন।' ট্রেনের শব্দ আর দোলায় সকলের চোখেই যেন তন্দ্রা আসছে। আর একটু পরেই রাত নামবে। মথুরবাবুর স্ত্রী সকলকেই এক প্রস্থ খাইয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরের হাতে ধরা রয়েছে দেওঘরের বিখ্যাত একটি প্যাঁড়া। চলমান দৃশ্য

দেখছেন আর একটু একটু করে খাচ্ছেন। মথুরবাবু স্ত্রীকে ফিস ফিস করে বললেন, 'দেখ, দেখ, ঠিক যেন একটি শিশু।'

জগদম্বা বললেন, 'আমার ছেলে। মা আমাকে কেমন একটি ছেলে পাইয়ে দিয়েছেন দেখ।'

জগদম্বা বেশ ছড়িয়ে বসে পান সাজছিলেন। দুটি পান আলাদা করে সরিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'এ দুটো আমার বাবার, ইসপেস্যাল।'

লাল সূর্য পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। এতক্ষণের উজ্জ্বল প্রকৃতিতে শীত সন্ধ্যার একটা বিষণ্ণতা নেমেছে। একটু পরেই চরাচর তলিয়ে যাবে অন্ধকারে। ঠাকুর হঠাৎ গান ধরলেন,

বল রে বল শ্রীদুর্গানাম।
ওরে আমার আমার মন রে॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে পথে চলে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়॥
তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি সে যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী॥
তুমি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা চরণে বাজিব॥

গান ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে একটি মূর্ছনা। চলমান রেলগাড়ির চাকার শব্দের সঙ্গে মিলে অদ্ভুত এক স্বরধ্বনি। হৃদয় গল্প করছেন, 'মামার গান মানেই ভাব আর সমাধি।'

ঠাকুর ভাবের জগৎ থেকে নেমে আসার জন্যে একটুকরো প্যাঁড়া মুখে পুরলেন।

সকাল হল। আবার একটি ঝলমলে দিন। কামরার মধ্যেই ঠাকুর মৃদু মৃদু হাত তালি দিয়ে দুসার আসনের মাঝখানের অপরিসর জায়গাটিতে টলে টলে পায়চারি করছিলেন। ট্রেনের গতি কমছে, কোনো স্টেশান আসছে। ট্রেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে থামল। ঠাকুর জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বললেন, 'ও হৃদু, ইস্টিসান! চল না, একবার নেমে দেখি।'

মথুরবাবু বললেন, 'বাবা, কতক্ষণ থামবে জানা নেই, তুমি একবার নেমেই উঠে এস কিন্তু!' 'হ্যাঁ গো, সে তুমি আমাকে কি

বলবে! আমি কি জানি না, চিরকাল কোনো ইস্টিসানেই রেল থেমে থাকবে না।'

হৃদয়কে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অপরিচিত স্টেশানে নামলেন। বললেন, 'বাঃ, বেশ লাগছে রে হৃদু। ওই দেখ মালবাবু! ওই বোধ হয় মাস্টারবাবু! রেলগাড়ির ইঞ্জিনটা একবার দেখবি না! ধক্ ধক্ করে জ্বলছে আগুন!'

হৃদয় বুঝতে পারছেন সেই চির শিশুটির আবির্ভাব হচ্ছে। স্থান, কাল, সমাজ, সংস্কার কিছুই যার নেই। যে শুধু আনন্দ-স্বরূপ। হৃদয় দেখছেন, মামা নিজের খেয়ালে এগিয়েই চলেছে। হৃদয় চিৎকার করে বলছেন, 'তুমি যাচ্ছ কোথায় হন্ হন্ করে! ওদিকে তোমার কি আছে!' বলতে বলতেই ট্রেন ছেড়ে গেল। এক জানলায় জগদম্বার মুখ, তিনি কাঁদছেন, পাশের জানলায় মথুরা-মোহন। প্ল্যাটফর্মের কোথাও ঠাকুরকে দেখতে পেলেন না। হৃদয় দাঁড়িয়ে আছেন অসহায়ের মতো। এই বিদেশ বিভুঁই জায়গা, পরিচিত একজনও কেউ নেই। এখন কি হবে! দূর থেকে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল গার্ডসাহেবের কামরা। সমান্তরাল একজোড়া লাইন। শব্দহীন শূন্যতা।

একটি গাছের আড়াল থেকে ছেলেমানুষের মতো হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'হৃদে! কেমন লাগছে বল! পোঁটলা, পুঁটলি, গামছা, বটুয়া, জমিদারি ছাতা, আসা-শোঁটা কিছুই নেই। আছি তুই আর আমি, পকেট খালি। নে, এবার কি করবি কর! আমি ওই গাছতলায় বসছি।' ঝাঁকড়া একটি গাছের তলায় পরম নিশ্চিন্তে বসে পড়লেন ঠাকুর। মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। হৃদয়কে আরো রাগিয়ে দেওয়ার জন্যে বললেন, 'মনে কর না, আমরা সন্ন্যাসী! কৌপীন পরে গাছতলায় বসেছি। গাছের ডালে পাখি। ওরে এক ট্রেন গেছে ত কি হয়েছে, আবার ট্রেন আসবে। আয় না বোস না এখানে। দেখ না, হারিয়ে যেতে কী ভালই না লাগে!'

হৃদয় বললেন, 'মথুরবাবুর ট্রেন আর আসবে না। এর পরে যেটা আসবে, সেটায় উঠতে হলে টিকিট লাগবে। তোমার কাছে কত টাকা আছে!'

'টাকা! টাকা তো আমি মা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছি!'

'বেশ করেছ, এইবার জীবনটা বিসর্জন দাও এইখানে।'

ঠাকুর হাসছেন, আর সুর করে বলছেন,

'বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃখলু ভাগ্যন্তঃ॥'

হৃদয় একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসে বললেন, 'এইবার দেখা যাক তোমার মা কী করেন!'

ঠাকুর বললেন, 'সেইটা দেখাবার জন্যেই তো কায়দা করে নেমে এলুম রে! মথুরের গাড়িতে কাশী যাব কেন রে! আমি মায়ের ছেলে। মায়ের পাঠান গাড়িতে বিশ্বেশ্বরীর কাছে যাব।'

'হ্যাঁ, তোমার মা রেলকোম্পানি খুলবেন, লাইন পাতবেন, লোহা আর নাটবল্টু জোগাড় করে তোমার জন্যে কলের গাড়ি তৈরি করবেন। ততদিন তুমি বসে থাক এখানে। আমি থাকব না, আমি হেঁটে কাশী চলে যাব।'

'তুই যা। যা না! তবে আমি তোর আগে যাব।'

হৃদয় গুম মেরে বসে আছেন। রোদ ক্রমশই চড়ছে। মথুরবাবু বারাণসীধামে পৌঁছেই স্টেশান মাস্টারের অফিস থেকে তার করলেন, আমাদের দুজন যাত্রী প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছেন, পরের গাড়িতে তাঁদের পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। তার পেয়ে মাস্টারমশাই ছুটে এলেন। অবাক হয়ে দেখছেন, জ্যোতির্ময় এক দিব্যপুরুষ গাছের ছায়ায় বসে আছেন, নিশ্চেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন।

স্টেশান মাস্টার বললেন, 'আমার অফিসে বসবেন চলুন।'

ঠাকুর বললেন, 'এইখানেই বেশ আছি, এখুনি একটা ট্রেন আসবে।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'কে বললে!'

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'খোঁজ নিন।'

মাস্টারবাবুর ঘরে তার আসছে, যন্ত্রের সাঙ্কেতিক বাদ্যে আগের স্টেশানের খবর, একটি সেলুন-কার এই মাত্র স্টেশান ছেড়ে গেল। রেলের এক বড় অফিসার কাশী যাচ্ছেন। স্টেশানমাস্টার তাঁর কর্মীদের নিয়ে প্ল্যাটফর্মে তটস্থ। আসছেন তিনি, রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টেশানে ভীষণ ব্যস্ততা। ঝাড়ুদার একবার সব ঝাড়ু দিয়ে গেল আচ্ছাসে। একপাশে দুচারটে ভাঙা প্যাকিং বাক্স

পড়েছিল, একজন টানতে টানতে অন্তরালে নিয়ে গেল। একটা কুকুর বসেছিল। সেটার উপস্থিতিও সহ্য হল না, দূরদূর করে তাড়ান হল।

ঠাকুর হৃদয়কে ডেকে বললেন, 'কি বুঝছিস! এইবার আমার গাড়ি আসছে, ওই দেখ রেলের পাখা পড়েছে। বাঁশী বাজছে শুনতে পাচ্ছিস।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝকঝকে সেলুন-কার স্টেশানে ঢুকল। রাজেন্দ্রবাবু খাতির করে ঠাকুরকে আর হৃদয়কে কামরায় তুলে নিলেন, 'আমি বাগবাজারে থাকি, আমার নাম রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনার কথা আমি অনেকের কাছে শুনেছি, দেখুন ঈশ্বরের কি কৃপা, কোথায় দেখা হল! দক্ষিণেশ্বরের দেবতাকে নিয়ে যাচ্ছি কাশীর দেবতার কাছে।'

ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসছেন সাহেবী পোশাক পরা মানুষটির দিকে তাকিয়ে। হৃদয় অবাক হয়ে দেখছেন, গাড়ি নয় ত, যেন সাজান একটি ঘর। জানলায় জানলায় পর্দা, পুরু পুরু গদিঅলা সোফা, লেখার টেবিল, চেয়ার। জামা, প্যান্ট, টুপি, ছড়ি ঝোলাবার সুন্দর ব্যবস্থা। সুন্দর সুন্দর আলো। রাজেন্দ্রবাবুর চেহারাটিও বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। হৃদয় একটু জড়সড়, ঠাকুর কিন্তু স্বাভাবিক, এতটাই স্বাভাবিক, যেন গাড়িটা তাঁরই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কাশী এসে গেল। গঙ্গার বাতাস গায়ে লাগা মাত্রেই ঠাকুরের ভাবান্তর। হৃদয় ভাবছেন, এরপর কি হবে। স্টেশানে মথুরবাবুর যদি কেউ না থাকেন, তাহলে যাব কোথায়। রাজেন্দ্রবাবু সাবধানে ঠাকুরকে নামিয়ে দিলেন। তাঁর আর কিছু করার নেই। রেলের কর্মচারিরা বড়কর্তাকে খাতির জানাবার জন্যে ব্যস্ত। হৃদয়ের কাঁধে ভর দিয়ে ঠাকুর ফাঁকায় সরে এলেন।

দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মথুরবাবু স্টেশানে লোক রেখেছিলেন। গাড়িও ছিল। রাজপথ ধরে এক্কাগাড়ি খুব ছুটছে। কতদিনের প্রাচীন নগরী। কত লোক, কত গাড়ি, কত দোকানপাট। ঠাকুর অবাক হয়ে দেখছেন, শুধু দেখছেন। ভাবছেন, সারা পৃথিবীতে সাতটি মোক্ষক্ষেত্রের একটি হল এই কাশী। বিশ্বনাথের রাজ্য, শিবপুরী। উত্তরবাহিনী গঙ্গা। উত্তর-পশ্চিমে বরুণা, দক্ষিণ-

পশ্চিমে অসি নদী। তিনটি দিক ঘিরে রেখেছে এই তিন নদী। পুরাণে আছে, মা দুর্গার দুই সহচরী, জয়া আর বিজয়া এই পৃথিবীতে বরুণা আর অসি নামে দুটি নদী হয়ে কাশীক্ষেত্রে পাপীদের প্রবেশ প্রতিরোধ করছেন। মা অন্নপূর্ণার কৃপায় কাশীতে কেউ অভুক্ত থাকে না।

ঠাকুর এই সব চিন্তায় বিভোর, গাড়ি এসে থামল মথুরবাবুর এক জমিদার বন্ধু রাজাবাবুর বাড়িতে, হৃদয় বললেন, 'নামো, আমরা এসে গেছি।'

ঠাকুর নামতে নামতে বললেন, 'এ কি রে হৃদয়, এখানে যে বড় বিষয়ের গন্ধ, এখানে থাকব কি করে?

হৃদয় বললেন, 'পঞ্চবটীর জঙ্গলে থেকে তোমার স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে, রাজবাড়ি সহ্য হবে কেন? এখানে ঝাউতলা নেই, তোমার গাড়ুটাও নেই।'

মথুরামোহন বেরিয়ে এলেন, 'বাবা, তুমি দেখালে বটে। খামোখা কষ্ট হল তোমার।'

ঠাকুর বললেন, 'না গো রাজার মতো এলুম। লাইনের ওপর সুন্দর সাজান গোজান একটা ঘর যেন! আমাদের বাগবাজারের রাজেন্দ্রলালের গাড়ি। সে কি খাতির সেজবাবু!'

ঠাকুরের জন্যে আলাদা একটি ঘর। পাশেই সুন্দর কেদারঘাট। রাজাবাবুদের কর্মচারীরা হুকুম তামিলের জন্যে সদা প্রস্তুত। তাদেরই একজন হৃদয়কে সাবধান করে গেলেন, 'ছাতে যাবেন না। বাঁদরে আঁচড়ে কামড়ে দেবে!'

ঠাকুর বললেন, 'সে কী রে! গঙ্গা দেখব না! এখানে কী ঘরের দেয়াল আর মোটা মোটা বড়লোক দেখতে এসেছি!'

হৃদয় বললেন, 'আঃ মামা! তোমার দেখি বড়লোকের ওপর ভীষণ রাগ! যিনি তোমাকে এত আদর করে কাশী নিয়ে এলেন তিনিও ত বড়লোক।'

'সে হল আমার মায়ের দেওয়ান। শোন, আমি এখুনি কেদার-ঘাটে চান করতে যাব। তোর ইচ্ছে হয় রাজবাড়ির আদরে থাক, আমি শ্মশানে থাকব।'

জগদম্বা এসে ঠাকুরকে শান্ত করলেন। বললেন, 'সব ব্যবস্থা

তোমার ছেলে করে রেখেছে, গাড়ি, পাল্কি, বজরা। একটু বিশ্রাম করে নাও। আমরা কেউই বসে থাকার জন্যে আসিনি। তীর্থে এসেছি ঘোরার জন্যে।'

ঠাকুর শান্ত হলেন তখনকার মতো। তবে জগদম্বা বুঝে গেলেন, ঠাকুরের এখানে থাকা চলবে না। এই পাগলটিকে তার চেয়ে কে বেশি চেনে! কখনো কোলের সন্তান, কখনো সখী, কখনো পিতা, কখনো গুরু! রাজাবাবুরা বড় বিষয়ী, অহংকারী তো বটেই।

কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর হৃদয়কে বললেন, 'আমি শৌচে যাব।'

হৃদয় পুঁটলি পোঁটলা নিয়ে বসেছিলেন, মামার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'যাবে যাও।'

ঠাকুর বললেন, 'যাবে যাও মানে! কাশী সুবর্ণময়। এখানে শৌচাদি করে সুবর্ণময় বারাণসীকে অপবিত্র করতে পারব না।'

হৃদয় অবাক হয়ে মামার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। 'সে আবার কি! এখানে করবে না ত কোথায় করবে? কলকাতায়?'

'জায়গা আমার ভাবা হয়ে গেছে?'

'কোথায় শুনি।'

'ওই অসী নদীর পারে। ওই জায়গাটা বারাণসীর বাইরে।'

'ওখানে যাবে কি করে, সাঁতরে?'

'তুই যা, গিয়ে মথুরকে বল একটা পাল্কির ব্যবস্থা করে দিতে। আমরা পাল্কি চেপে যাব আর আসব।'

'লোকে পাল্কিতে চেপে বিয়ে করতে যায় তুমি যাবে শৌচে!'

শুনে মথুরামোহন খুব খানিক হাসলেন। স্ত্রী জগদম্বাকে বললেন, 'অনেক কিছু ত শুনেছ, এইটা কি শুনেছ, পাল্কি চেপে শৌচে যাওয়া! এই না হলে আমার বাবা, সব বাবার সেরা বাবা।'

মথুরবাবু হৃদয়কে বললেন, 'যাও গিয়ে বলো, সদরে পাল্কি মজুত। তুমি কিন্তু সব সময় সঙ্গে থেকো! বললেও একা ছাড়বে না।'

॥ দুই ॥

দুপুরবেলা আহারাদি হয়ে গেছে। বেশ চর্বচুষ্য আয়োজন। মথুরামোহন খাইয়ে মানুষ। রাজাবাবুদের আতিথেয়তা রাজকীয়।

ঠাকুর নিজের ঘরটিতে বেশ ভব্যযুক্ত হয়ে বসে আছেন। হৃদয় নিদ্রালু। ঠাকুর বসে বসে বিশ্বনাথজির কথা ভাবছেন। ভেতরটা ছটফট করছে। কতক্ষণে মন্দিরে যাবেন! বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ ভারতে আছেন, তাঁদের একটি হলেন কাশীর বিশ্বনাথ। বাবার কাছে ছেলেবেলায় বিশ্বনাথ মন্দিরের গল্প শুনেছিলেন। মুসলমান হানাদাররা বারে বারে ভেঙেছে হিন্দু রাজারা বারে বারে গড়েছে। ভাঙা গড়ার খেলা। মহম্মদ ঘোরী, নামটা মনে আছে, সালটাও মনে আছে, ১১৯৪ সাল। ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবক বাবা বিশ্বনাথের মন্দির ছাড়াও যেখানে যত হিন্দুমন্দির ছিল কাশীতে সব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে চলে গেল। এর পর এল সুলতানা রাজিয়া। বিশ্বনাথের মন্দিরের জায়গায় বসিয়ে দিলে মসজিদ। হিন্দুদের অনেক চেষ্টায় মন্দির ফিরে এল, সিকান্দার লোদী এসে ধ্বংস করে দিলে আবার। এরপর রাজা টোডরমল বিশাল একটি মন্দির করে দিলেন, একশো বছরও গেল না আওরঙ্গজেবের আক্রমণে মন্দির চুরমার, আবার মসজিদ। পরে ওই মসজিদের পাশের জমিতে কোনো রকমে একটি মন্দির নির্মাণ করে বাবা বিশ্বনাথকে প্রতিষ্ঠা করা হল। সেইখানেই রানী অহল্যাবাঈ বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দিলেন। বীর রণজিৎ সিং চূড়াগুলিকে সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিলেন।

কাশীতে এখনো বেশ শীত। পঞ্চবটীতে বসন্ত। ঠাকুর একটি চাদর জড়িয়ে বসলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা ভাবছেন এইবার। নিজের মনেই বলছেন, কী রাজা বলো তো! রাজার মতো রাজা। দাতা হরিশ্চন্দ্র! ঠাকুর নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছেন। একই সঙ্গে কথকঠাকুর আবার শ্রোতা। বিশ্বামিত্র মুনি পরীক্ষা করতে এসেছেন, দেখি রাজা, তুমি কত বড় দাতা! তোমার সসাগরা পৃথিবী আমাকে দান করে দাও। হরিশ্চন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে দান করে দিলেন। এখন কী হবে! তাঁর তো দাঁড়াবার মতো সূচ্যগ্র ভূমিও নেই। বিশ্বামিত্র বললেন, 'যাও, কাশীতে যাও, কাশী ত্রিভুবনের মধ্যে নয়। তোমার থাকবার একমাত্র স্থান ওই কাশী।'

না, এইখানেই শেষ নয়, তারপর কি হল শোনো না। দানের পর দক্ষিণা দিতে হবে ত, তা না হলে দান সম্পূর্ণ হবে না। বিশ্বামিত্র

রাজা আর তাঁর স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে কাশীতে এলেন। সকলে মিলে বিশ্বেশ্বর দর্শন করলেন। বিশ্বামিত্র বললেন, 'রাজা, আমার দক্ষিণা।' কিছুই যাঁর নেই তিনি দক্ষিণা দেবেন কোথা থেকে। তখন স্ত্রী শৈব্যাকে বিক্রি করে দিলেন এক ব্রাহ্মণের কাছে! পুত্র রোহিতাশ্বও মায়ের সঙ্গে চলে গেল সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে। স্ত্রীকে বিক্রি করেও দক্ষিণার পুরো টাকা হল না, তখন রাজা নিজেকে এক চণ্ডালের কাছে বিক্রি করলেন। শ্মশানে বসে আছেন রাজা হরিশ্চন্দ্র, চণ্ডালের বেশ, হাতে লাঠি। চারপাশে দাউ দাউ চিতা, পোড়া শবের গন্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ দুটি ভিজে ভিজে, তাকিয়ে আছেন কাশীর আকাশের দিকে।

নিমেষে একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলেন ঠাকুর। দেখছেন এক উজ্জ্বলকান্তি সন্ন্যাসী সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'ওঠো!' ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। 'পাকড়ো! আমার হাত ধরো!'

ঠাকুর বাধ্য ছেলের মতো সন্ন্যাসীর হাত ধরলেন। চলেছেন দুজনে। কোথায় যাচ্ছেন জানেন না। সামনেই একটি ঠাকুরবাড়ি। সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রবেশ করলেন। সিঁড়ি ভেঙে দুজনে মন্দিরের ওপরতলায় উঠলেন। প্রবেশ করলেন গর্ভমন্দিরে, সোনার অন্নপূর্ণা, সামনে রুপোর মহাদেব। সন্ন্যাসী অদৃশ্য।

মথুর সহধর্মিণী জগদম্বা ঘরে এসে দেখলেন, ছেলে বেহুঁশ। অস্ফুটে একটি গানের কলি গাইছেন, 'অন্তরে জাগিছ মা অন্তর-যামিনী / কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী॥' দুচোখের কোলে দুবিন্দু অশ্রু। পাশের ঘরে মথুরবাবু ফরসি টানছেন, ফুরফুর শব্দ, অম্বুরির সুবাস।

একসময় তাকালেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যেন স্বপ্ন ভাঙল! প্রথমে জগদম্বাকে যেন চিনতে পারলেন না, তারপর খুব মৃদু গলায় বললেন, 'কী গো?'

জগদম্বা বললেন, 'চলো। মন্দিরে যাবে না!'

'আমি এই তো এলুম।'

'কোথায় গিয়েছিলে, যে এলে!'

'এক সন্ন্যাসী, কে তিনি জানি না, আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা মন্দিরে। সোনার মাকে দেখে এলুম গো,

রুপোর মহাদেব দাঁড়িয়ে আছেন হাত পেতে।'

'সে কী গো! তুমি দেখলে! সোনার অন্নপূর্ণা ত বছরে মাত্র তিন দিন দেখা যায়। দীপাবলির সময়, চতুর্দশী থেকে প্রতিপদে!'

'তাই আমাকে দেখিয়ে দিলে গো, কৃপা করে!'

জগদম্বা বড় সুন্দর মেয়ে, রানীর আদলেই গড়া। ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, প্রেম, সরলতার অধিকারিণী। জগদম্বা বললেন, 'চলো চলো, গঙ্গার ওপর বেলা ডোবার আলো দেখাব চলো।'

পানসি বেঁধেছে ঘাটে। পর পর কয়েকটি। উত্তরবাহিনী গঙ্গা খরস্রোতা। হর হর গঙ্গা। সাবধানে পানসিতে উঠলেন মথুরবাবু, হাত ধরে তুলে নিলেন ঠাকুরকে। আর একটিতে আসাশোঁটাধারী মথুরামোহনের কর্মচারীরা। আড়ম্বরের প্রয়োজন আছে বই কি! জগৎ যেমন ঈশ্বরের, সেইরকম বিষয়ীরও ত বটে! মন্দিরের ভিড়ে পথ করে নিতে একটু দেখনদারির দরকার।

মথুরামোহন চলেছেন ছত্রপতি হয়ে। বড় মানুষের খাতিরই আলাদা। ঠাকুরের খুব আনন্দ। বিশ্বনাথের মন্দিরের গলির মুখে এসেই ঠাকুরের ভাবান্তর। মন্দির-অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসছে ভক্তদের সমবেত আহ্বান, জয় বাবা বিশ্বনাথ। মন্দিরের চারদিকেই প্রাচীর। গলির ওপরেই সদর ফটক। ফটকের পরেই বিশাল প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণেই বিশ্বনাথের মন্দির আর নাটমন্দির। ঠাকুরের ভাব এসে গেছে। তিনি কি দেখবেন, তাঁকেই সবাই দেখছে। কে এই মহাপুরুষ!

পাথরের তৈরি গর্ভমন্দিরটি তেমন প্রশস্ত নয়। দর্শনার্থীদের ঠেলাঠেলি। মথুরবাবু আর হৃদয় ঠাকুরকে ধরে আছেন দুপাশ থেকে। ছেড়ে দিলেই ঠাকুর পড়ে যাবেন। মন্দিরের স্বাস্থ্যবান, সুন্দর পাণ্ডারা মথুরবাবুর মতো একজন বড় মানুষকে দেখে এগিয়ে এসেছেন। ভাবে টলমলো দিব্যকান্তি ঠাকুরকে দেখে দর্শনার্থীরা আরো জোরে ধ্বনি দিতে লাগলেন, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ'।

নাটমন্দিরের চূড়া গম্বুজের মতো। মূল চূড়াটিকে ঘিরে অনেকগুলি ছোট ছোট চূড়া। গর্ভমন্দিরের ঈশান কোণে বাবা বিশ্বনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ। ঠাকুর সেই দিকে এগিয়ে চলেছেন।

সম্পূর্ণ সমাধিস্থ অবস্থা। ঠোঁটের কোণে সেই অদ্ভুত সুন্দর জগৎ-মোহিনী হাসিটি। মানুষ আর সময় দুটোই যেন স্তম্ভিত। এই দৃশ্য, এই রূপ, এই লীলা সহজে কি দেখা যায়! স্বয়ং শিব যেন দেহধারণ করে সাক্ষাৎ হয়েছেন।

নাটমন্দিরের মাঝখানে বৈকুণ্ঠেশ্বর শিব। মন্দিরের উত্তর দিকে 'জ্ঞানবাপী'। একটি কূপ। বিধর্মীরা মন্দির ধ্বংস করে দিলে এই কূপে লিঙ্গটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ঠাকুর সেই কূপটির কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

রাতে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় মজলিশ বসেছে। মথুরবাবুর অনুরোধে ঠাকুরও আছেন। নানা রকম আলোচনা। ঠাকুর ভেবে-ছিলেন, বারাণসীর মানুষ অন্তত একটু বিষয়মুক্ত হবে! একটু ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করবে। কোথায় কি? প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল, একবারও বাবা বিশ্বনাথ কি মা অন্নপূর্ণা আলোচনায় এলেন না। রাজাবাবুরা কেবল ব্যবসার কথাই বলে চলেছেন, এই এত টাকা লোকসান হয়েছে, ওই ওইটাতে অত টাকা লাভ হয়েছে। আর একটু ধরে রাখতে পারলে আরো একটু বেশি লাভ হত।

ঠাকুর একপাশে বসে কাঁদছেন। মনে মনে বলছেন, 'মা, কোথায় আনলে। আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম মা। তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনীকাঞ্চনের কথা। কিন্তু সেখানে তো বিষয়ের কথা শুনতে হয় নাই।'

মথুরবাবু গল্প করলেও সর্বক্ষণ ঠাকুরের ওপর নজর ছিল। রাতে একান্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না!'

ঠাকুর বললেন, 'আমি বরং দক্ষিণেশ্বরে আমার মায়ের কাছেই চলে যাই!'

মথুরবাবু বললেন, 'তুমি চলে গেলে আমার তীর্থ হবে কি করে! আমি কালই অন্য ব্যবস্থা করছি। আমি বুঝতে পেরেছি, এ পরিবেশ তোমার নয়।'

সেই রাতেই মথুরবাবু তাঁর ম্যানেজারকে বললেন, 'তুমি এখুনি বেরোও, এই কেদারঘাটের কাছেই পাশাপাশি দুটো বাড়ি চাই।'

ম্যানেজার বললেন, 'আজ্ঞে আছে, যখনই বলবেন। সোনার-

পুরাতে পাশাপাশি দুটো বাড়ি।'

মথুরবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'তাহলে কাল সকালেই আমরা যাচ্ছি।'

পরের দিন সকালে নতুন জায়গা দেখে ঠাকুর আনন্দে গান ধরলেন। পাথরের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। পাশ থেকে আর একটা সিঁড়ি বেরিয়ে আর একটা অংশে। বেশ রহস্যময় নির্জন। দোতলার যে হলঘরটিতে ঠাকুর থাকবেন তার বড় বড় আটটি দরজা। ঠাকুর হাততালি দিতে দিতে একবার এ পাশে যাচ্ছেন, একবার ওপাশে। নিশ্চয় কোনো রাজার বাড়ি।

ঘরের মধ্যে নিজের ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে ঠাকুর বললেন, 'আমি তাহলে কেদারনাথকে দর্শন করে আসি। এই তো কাছেই।'

মথুরবাবু বললেন, 'পালকি করে যাও।'

ঠাকুর বললেন, 'না গো, আমি পায়ে পায়ে ঠিক পৌঁছে যাব।'

কাশীর বিখ্যাত বাঙালিটোলা। ঠাকুর হৃদয়কে নিয়ে হাঁটছেন। দুপাশে বিশাল বিশাল বাড়ি। খাড়া পাথরের দেয়াল, মাঝে সরু গলি। কেউ স্নান করে আসছেন, কেউ স্নান করতে যাচ্ছেন।

ঠাকুর হৃদয়কে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। বিপরীত দিক থেকে এক সাধিকা আসছেন। তাঁর সুঠাম দীর্ঘ দেহ। তাঁর কেশ আলুলায়িত। তাঁর পরিধানে রক্ত গৈরিক। তাঁর উন্নত বক্ষদেশে রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁর মুখে উজ্জ্বল প্রশান্তি।

হৃদয় দেখছেন, দুজনে মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ তুমি?'

সাধিকা বললেন, 'তিনি যেমন রেখেছেন।'

হৃদয় ক্রমশই মামার আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন। চিনতে পেরেছেন, মামার গুরু, ভৈরবী যোগেশ্বরী। মনে পড়ছে, কামারপুকুরের সেই বিশ্রী ঘটনা।

ভৈরবী জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ভাল আছ হৃদয়!'

হৃদয় এই সুযোগে টপ করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। ভৈরবী হাসছেন। অদ্ভুত সুন্দর হাসি। অতীতের কোনো প্রসঙ্গই এল না। অতীত আর ভবিষ্যৎ, দুটোই গৃহীদের, সংসারীদের নাড়াচাড়ার বিষয়। অতীত অনুশোচনার, ভবিষ্যৎ

আতঙ্কের। ঈশ্বর কালাতীত, সন্ন্যাসীকেও কাল বাঁধতে পারে না।

ঠাকুর বললেন, 'যাবে কোথায়! চলো চলো কেদারবাবার কাছে চলো।'

কতদিন পরে দেখা! কামারপুকুরের সেই বিষণ্ণ সকাল। সুর অসুরের খেলা! হৃদয়ের সর্বগ্রাসী ঈর্ষার তাণ্ডব। সেই ভাঁড় ছুঁড়ে মারা, রক্তপাত। অবতারের ক্ষমতা কি ইন্দ্রিয়ের পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণে আনেন! গৌতম বুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীচৈতন্য পেরেছিলেন? পেরেছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ!

ঠাকুর ভৈরবীকে বললেন, 'সেই যে নিজের হাতে মালাটি গেঁথে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে চলে গেলে, তারপর?'

'তারপর সোজা এই কাশীতে।'

'এখানে তুমি উঠেছ কোথায়?'

'চৌষট্টিযোগিনীতে। তুমি কোথায় আছ?'

'এই ত কাছেই সোনারপুরায়।'

'সারদা এসেছে?'

'না তো। মথুরবাবুরা এসেছেন, সঙ্গে অনেক লোক।'

'নির্জন নিরিবিলিতে আমার কাছে এস না!'

'তোমার জায়গাটা আজ দেখে আসি চলো। একেবারে দল ছাড়া হতে পারব না, তবে মাঝে মাঝে তোমার কাছে আসব। আমাদের শেষ কথাটা যে এখনো বাকি আছে গো! তন্ত্রের সাধন ত হয়েছে, কিন্তু প্রেমের সাধন! প্রেম না সাধলে বৃষ্টি হবে না যে! বৃষ্টি ছাড়া চাষ কি হয় যোগেশ্বরী!'

হৃদয় বললেন, 'তুমি হাঁটতে পারবে?'

ঠাকুর বললেন, 'কেন পারব না, গান গাইতে গাইতে হেঁটে যাব। এই সোনার কাশীতে দেহ সোনা, মন সোনা, পথঘাট, বাড়ি পাথর সব সোনা। তিনি আমাকে কৃপা করে দেখিয়ে দিয়েছেন রে! শিবমহিমা কাশীর মাহাত্ম্য। এই শিবপুরী সোনায় তৈরি। এখানে মাটি কোথায়, পাথর কোথায়, যুগ যুগ ধরে সাধুভক্তদের সোনার মত উজ্জ্বল মনের ভাব পরতে পরতে সাজান, তাইতে সব ঢাকা পড়ে গেছে। বাইরে যা দেখছিস, সে ওই নিত্য-সত্যরূপ জ্যোতির্ময় ভাবঘন মূর্তির ছায়া মাত্র। তাই তো আমি পাল্কি চড়ে অসীর

তীরে যাই শৌচে।'

ঠাকুর তাঁর নিজের ভাবে কথা বলছেন। লক্ষ্য করেননি ছোট-খাট একটি ভিড় জমে গেছে। কথা শেষ হতেই সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি দিলেন, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ। জয় বাবা অনাদিনাথ।' ঠাকুর সংকুচিত হলেন। না, না, আমি কলকাতার কেশব নই। আমি মা ভবতারিণীর সন্তান। দক্ষিণেশ্বরে মায়ের আশ্রয়ে থাকি। মা যেমন বলান, মা যেমন করান।

সৌম্য সুন্দর তরুণ এক সাধক সেই জমায়েত থেকে বেরিয়ে এসে ঠাকুরের হাত দুটি ধরে বললেন, 'মহাপুরুষ, একদিন আমাদের মঠে দয়া করে আসুন না। আমরা নানক পন্থী।'

ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ করলেন, 'নানকপন্থী! আমার বন্ধু কুঁয়োর সিং-ও নানকপন্থী। সে সৈনিক। আমি তার সঙ্গে চানকে গিয়ে তাদের উৎসব দেখেছি। খুব ভক্তি, খুব নিষ্ঠা। আমি যাব। মঠটা কোথায়?'

তরুণ সন্ন্যাসী বললেন, 'ওই যে দুর্গাবাড়ি, উত্তরে পাড়-বাঁধানো পুষ্করিণী।'

ভৈরবী বললেন, 'দুর্গাকুণ্ড।'

'হ্যাঁ, দুর্গাকুণ্ড। দুর্গাকুণ্ডের পুবদিকে কুরুক্ষেত্র তালাও। ওরই উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে আমাদের মঠ। আপনি আসবেন।'

ঠাকর বললেন, 'এখন গেলে কেমন হয়!'

হৃদয় বললেন, 'একসঙ্গে কত জায়গায় যাবে?'

ঠাকুর সাধুটিকে বললেন, 'আমি তাহলে কাল সকালে যাব।'

চৌষট্টিযোগিনীতে ভৈরবীর আবাসস্থলটি মন্দ নয়। ভৈরবী করাঘাত করা মাত্রই মধ্যবয়সী এক মহিলা দরজা খুলে দিলেন। ভৈরবী বললেন, 'মোক্ষদা! এমন দিন নেই যার কথা একবার না একবার হয়েছে, আমার সেই শিষ্য, অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। দ্যাখো ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন। পথ থেকে তুলে এনেছি পরশমানিক। লোহাকে সোনা করে নে মোক্ষদা!'

ঠাকুর প্রতিবাদ করতে করতে ঘরে ঢুকলেন, 'অবতার, অবতার করবে না ব্রাহ্মণী। তিনটে কথায় আমার খুব বিরক্তি হয়, বাবা, গুরু আর অবতার। আমি মানুষ। আমি আমার জীবন-মরণ

সাধনায় ভগবানকে দেখেছি। আমি তাঁর কথা শুনতে পাই। আমি বুড়ি ছুঁয়ে আছি। মা আমাকে সার বুঝিয়েছেন, ঈশ্বরকে জানাই জ্ঞান, না জানাটাই অজ্ঞান। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু!'

মোক্ষদা পাথরের মেঝেতে দুভাঁজ করে একটি কম্বল পেতে, ভক্তিভরে, হাত জোড় করে ঠাকুরকে বললেন, 'আপনি বসুন।'

ঠাকুর বসে জোরে জোরে দু-তিনবার ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, 'সাধনের গন্ধ পাচ্ছি। শিবের গন্ধ।'

ভৈরবী হাসলেন, 'ঠাকুর! দিন চলে যায়। মানুষ বদলে যায়, কিন্তু ভগবান সেই একই থাকেন। আমি আর আগের আমি নেই, তুমি কিন্তু সেই তুমিই আছ।'

মোক্ষদা বললেন, 'আমি আপনাকে প্রণাম করতে পারি!'

ঠাকুর মধুর কণ্ঠে বললেন, 'কেন গো মা?'

'আমার যে অত ভাষা নেই ঠাকুর, তবে আমার এই জীবন, আমার এত দিনের কাশীবাস সার্থক। আজ শিব আমাকে দর্শন দিলেন রামকৃষ্ণ রূপে।'

মোক্ষদা আর কিছু বলতে পারলেন না। নীরব, দুচোখে অবিরল ধারা। ঠাকুরের মুখেও কোনো কথা নেই। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো বিশাল গম্ভীর। ক্রমশই এগোচ্ছেন সমাধির দিকে। সমাহিত ঠাকুর, সামনে দুই সাধিকা। এইভাবে অনেকটা সময় কেটে গেল। প্রকৃতিস্থ হয়ে ঠাকুর ভৈরবীকে বললেন, 'কই, দক্ষিণেশ্বরে তুমি আমাকে যেমন খাইয়ে দিতে, সেই রকম খাইয়ে দেবে না! আমার যে খিদে পেয়েছে!'

ভৈরবী বললেন, 'আমার সেই সাহস, সেই শক্তি যে আর নেই।'

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'এ তোমার কি কথা গো! যুগ বদলায়, যশোদা আর গোপাল কী বদলায়! তোমার সেই যশোদার সাজ, অলঙ্কার সব গেল কোথায়!'

'সে সব তো আমার ছিল না। ধার করা।'

'শোনো ব্রাহ্মণী, পোশাক ধার করা, কিন্তু ভাবটা ত নিজস্ব! ভাব হারাবে কেন! আমি কী হারিয়েছি?'

মা আমাকে বলেছিলেন, 'ভাবমুখে থাক, আমি তাই থাকব। আমার খিদে পেয়েছে!'

ভগবানকে মানুষ যে ভাবে নৈবেদ্য দেয় মোক্ষদা ঠিক সেই ভাবে একটি নৈবেদ্য সাজিয়ে এনে ঠাকুরের সামনে ভক্তিভরে নিবেদন করলেন।

হৃদয় একটু তাড়া দিলেন, 'এবার চলো। সেজবাবু আজ পঞ্চতীর্থ দর্শনের ব্যবস্থা করেছেন।' ঠাকুর উঠতে উঠতে ভৈরবীকে বললেন, 'আবার আমি আসব। তোমার জন্যে আমার কিছু করার আছে।'

॥ তিন ॥

গঙ্গার তীরে মহা সমারোহ। ঝালর লাগান রুপোর ছাতার তলায় মথুরামোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ। লাঠিধারী পাইক বরকন্দাজ চারপাশে। পরিবারস্থ আর সব লোকজন। একের পর এক পানসি। মথুরবাবু ঠাকুরকে বলেছেন, 'তুমি কিছু মনে কোরো না। এই আমার শেষ তীর্থ। সঙ্গে তুমি। আমি একটু রাজসিক হব। লাখটাকা খরচ করব।'

ঠাকুর বলেছিলেন, 'করো। তীর্থে দান ধ্যান করতে হয়।'

পঞ্চতীর্থ হল অসিসঙ্গম, দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা আর বরুণাসঙ্গম।

পানসি চলেছে তরতরে গঙ্গায়। মথুরবাবুর খাস পানসিতে ঠাকুর ছইয়ের মধ্যে বসে আছেন ফুরফুরে বাতাসের মতোই ফুরফুরে হয়ে। কাশী মানেই শিব, কাশী মানেই গঙ্গা, অপূর্ব সব ঘাট, প্রশস্ত সোপানশ্রেণী। কাশীর অধিকাংশ পুণ্যার্থী মানুষ যেন ঘাটেই পড়ে থাকেন! কোথাও কাশীর বিখ্যাত পালোয়ানদের ডন বৈঠক। কোথাও কথক ঠাকুরের পাঠ। কোথাও ছাতার তলায় ফুল বেল-পাতা, তেল মালিশঅলা। সে যেন এক মহা সমারোহ। দিবারাত্রের শিব উৎসব।

মথুরবাবুর নৌকা মণিকর্ণিকা ঘাটের সামনে এসে গেছে। পাশেই মহাশ্মশান! সার সার চিতা জ্বলছে। চিতাধূমে চারপাশ সমাচ্ছন্ন। চিতার গন্ধ। ঠাকুর এতক্ষণ ভাবস্থ হয়ে বেশ বসে-ছিলেন। অন্য আরোহীরাও নীরব। মথুরবাবু বললেন, 'মণি-কর্ণিকা, একসঙ্গে এত চিতা আর কোথায় জ্বলে!'

ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন। সে কী আনন্দ তাঁর। খেয়াল নেই যে ভাসছেন জলে, টলটলে নৌকায়। ছুটে বেরিয়ে

গেলেন ছইয়ের বাইরে। আতঙ্কের রব উঠল, 'ধরো ধরো' পড়ে গেলেই ভেসে যাবেন স্রোতে।' মথুরবাবুর পাণ্ডা আর মাঝিমাল্লারা ঠাকুরকে জলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে এসেছে ধরতে। ধরার প্রয়োজন হল না। ঠাকুর খাড়া দাঁড়িয়ে, নৌকার একেবারে কিনারায়, সম্পূর্ণ সমাধিস্থ। মথুরবাবু সাবধান করে দিলেন, 'কেউ শরীর ছোঁবে না। কেবল সাবধান থাকো।'

স্বয়ং মথুরামোহন, বাংলার প্রতাপান্বিত, সুখ্যাত জমিদার এগিয়ে এলেন। দাঁড়ালেন ঠাকুরের একপাশে।

আর একপাশে হৃদয়। সমাধিস্থ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, মুখমণ্ডলে সেই অলৌকিক জ্যোতির উদ্ভাস। সেই উদ্ভাসিত স্বর্গীয় হাসি। ওদিকে মণিকর্ণিকায় সার সার বহ্নিমান চিতা। চিতাধূমে ঊর্ধ্বাকাশ সমাচ্ছন্ন। বাতাসে পাক খাচ্ছে জটাজালের মতো। শতশত অগ্নি-জিহ্বা শূন্যকে লেহন করছে। ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন স্থির, নিশ্চল। মাঝি-মাল্লারা বিস্ময়ে হতবাক। জীবনে তাদের এ অভিজ্ঞতা হয়নি, আর হবেও না।

ভাবসম্বৃত। উপবিষ্ট ঠাকুর।

'কী দেখলেন অমন করে? শ্মশান! সে ত ভয়ঙ্কর!'

'সে কী! সে যে মুক্তির স্থান!'

আমি কী দেখছিলুম জান—'দেখলাম পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পাশে আগমন করছেন এবং প্রত্যেক দেহকে সযত্নে উত্তোলন করে তার কর্ণে তারক-ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করছেন! —আর সর্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর-পার্শ্বে সেই চিতার ওপর বসে স্থূল সূক্ষ্ম; কারণ প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্কার বন্ধন খুলে দিচ্ছেন আর নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করে স্বহস্তে তাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করছেন।

ঠাকুর আবার উৎফুল্ল 'আরে, তোমাদের নৌকা ভেড়াও মাঝি। ওই দেখছ না ঘাটে বসে আছেন সচল বিশ্বনাথ, ত্রৈলঙ্গস্বামী। আমার যে অনেক দিনের ইচ্ছে, বাবাকে পায়েস খাওয়াব নিজের হাতে।'

মণিকর্ণিকার ঘাটে ভিড়ছে শ্রীরামকৃষ্ণের পানসি!

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের মণিকর্ণিকা ॥

বারাণসীর গঙ্গায় এই সুসজ্জিত বজরাটি কার? নিশ্চয় কলকাতার কোনো বড় মানুষের! যাঁরা জানেন তাঁরা বললেন, জানবাজারের রানী রাসমণির জামাই জমিদার মথুরামোহন বিশ্বাসের। আর বজরায় খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন; দেখতে পাচ্ছ, ভাবে বিভোর আত্ম-ভোলা মানুষটি—দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশের সেরা সেরা পণ্ডিতদের অভিমতে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। ওঁর সঙ্গে মা কালী কথা বলেন, খেলা করেন, বাগানে ফুল তোলেন। যখন পূজায় বসে মা ভবতারিণীকে ভোগ নিবেদন করেন, মা বলেন, তুই আগে খা, তবে আমি খাব। সে যে কি লীলা। অবতারের অবতার লীলা। সাধারণ মানুষের বোধ-বিশ্বাসের বাইরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে লাফাচ্ছেন, 'মাঝি পানসি ভেড়াও ঘাটে। দেখছ না কে বসে আছেন ঘাটে! বারাণসীর সচল বিশ্বনাথ, ত্রৈলঙ্গ-স্বামী।' মথুরবাবুর পাণ্ডারা, পানসির মাঝিরা আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছেন, ভাবে ভোলা অদ্ভুত এই মানুষটি যদি জলে পড়ে যান! সম্ভাবনা থাকলেও ঠাকুর পড়বেন না। তাঁর ইষ্ট যে তাঁকে ধরে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পানসি থেকে পাথর বাঁধান ঘাটে নামলেন! পানসি সামান্য কাত হয়ে আবার সোজা হল। হৃদয়, ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুরের ওপরবাহুটি বড় সাবধানে ধরে আছেন! বড় কোমল অঙ্গ তাঁর মামার। জোরে চেপে ধরলে ধরার জায়গাটা জবা ফুলের মতো লাল হয়ে যাবে। দুধাপ ওপরে বাঁ দিকের রানায় পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন ত্রৈলঙ্গস্বামী! মহাকাল যেন ক্ষণকালে স্তব্ধ! বাবা মৌনী অবলম্বন করে আছেন দীর্ঘকাল! ঠাকুর অবাক হয়ে দেখছেন। এক সাধক আর এক সাধকের মুখোমুখি। প্রবাহিত গঙ্গা ঠাকুরের পেছনে। এখানে ওখানে ভক্তজনের জটলা! অধিকাংশই বিধবা বাঙালী। কিছু শৈব সাধক। পাথরের ছাতার তলায় তলায় কথক ঠাকুর। প্রস্তুত হচ্ছেন কথকতার জন্যে। ঠাকুরের মুখটি যেন অবাক বালকের মতো। কাছ থেকে লক্ষ করছেন সাধকের লক্ষণ। ঠাকুর দেখছেন সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁর শরীর আশ্রয় করে

প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন! তাঁর থাকায় কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। উঁচু জ্ঞানের অবস্থা! শরীরের কোনো বোধ নেই। হুঁশই নেই। ত্রৈলঙ্গস্বামী দুধাপ ওপরে। ঠাকুর দুধাপ নিচে। দুজনেরই কোনো হুঁশ নেই। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জগৎ। হঠাৎ সাক্ষাৎ শিব ত্রৈলঙ্গ-স্বামী ঠাকুরের দিকে এগিয়ে ধরলেন ছোট্ট একটি কৌটো। ঠাকুর দেখলেন সুদৃশ্য একটি নস্যদানি। ঠাকুরকে অভ্যর্থনা আর সম্মান জানাচ্ছেন, আসুন, আসুন, দক্ষিণেশ্বরের তপোবনের মহাসাধক, আমরা যে এক গেলাসের ইয়ার। সেই গেলাসে টল টল করছে সচ্চিদানন্দ সুরা। ঠাকুর এক টিপ নস্যি কপালে ঠেকালেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী হাসলেন। ঠাকুর ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, ঈশ্বর এক না অনেক? ইশারায় উত্তর এল, সমাধিস্থ হয়ে দেখ তো এক; নইলে যতক্ষণ আমি, তুমি, জীব, জগৎ ইত্যাদি জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ অনেক।

ঠাকুর হৃদয়কে বললেন, 'দেখে রাখ, একেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বলে। পরমহংস কাকে বলে জানিস, 'পরমহংস তিন গুণের অতীত! তার ভেতর তিন গুণ আছে আবার নেই! ঠিক বালক, কোন গুণের বশ নয়। আরোপ একটা সাধনা। স্বভাব আরোপ। পরমহংসরা ছোট ছোট ছেলেদের কাছে আসতে দেয় তাদের স্বভাব আরোপ করবে বলে। আহা! সে বড় অপূর্ব অবস্থা! পরমহংস দেখে সবই তিনি। পাপই বলো পুণ্যই বলো সব ঈশ্বরের দান। তিনিই সুমতি দেন, তিনিই কুমতি দেন। তেতো-মিঠে ফল কি নেই? কোনো গাছে মিষ্টি ফল, কোনো গাছে তেতো কি টক ফল। তিনি মিষ্টি আমগাছও করেছেন আবার টক আমড়াগাছও করেছেন!

ঠাকুর বললেন, 'আয় না, কিছুক্ষণ বসি এখানে। মৌনী মহেশ্বরকে দেখি।'

দুজনে বসলেন! ঠাকুর বলে চলেছেন, অদ্বৈতজ্ঞান না হলে চৈতন্যদর্শন হয় না। চৈতন্যদর্শন হলে তবে নিত্যানন্দ। পরমহংস অবস্থায় এই নিত্যানন্দ। জানিস তো বেদান্ত মতে অবতার নেই। সে-মতে চৈতন্যদেব অদ্বৈতের একটি ফুট। চৈতন্যদর্শন কি রকম-এক একবার চিনে দেশলাই জেবলে অন্ধকার ঘরে যেমন হঠাৎ আলো।

বড় বড় লোকদের নানা কায়দার পানসি সব, একের পর এক ভেসে চলেছে। কোনো কোনোটায় গান-বাজনা। আহা! কাশী! এখানে দেহত্যাগ হলে পুনর্জন্ম হয় না। মোলায়েম বাতাসে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ পুলকিত। পেছনেই সাক্ষী শিব ত্রৈলঙ্গস্বামী।

ঠাকুর বলছেন, 'পরমহংস অবস্থায়—কর্ম সব উঠে যায়। পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা। এই অবস্থায় কেবল মনের যোগ। বাইরের কর্ম কখন কখন সাধ করে করে—লোকশিক্ষার জন্যে। কিন্তু সর্বদা স্মরণমনন থাকে।'

হৃদয় জিজ্ঞেস করলেন, 'ত্রৈলঙ্গমহারাজ সাকারবাদী না নিরাকারবাদী।'

'ত্রৈলঙ্গস্বামী নিরাকারবাদী। এঁরা আপ্তসারা—নিজের হলেই হল! ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে। যেমন কুম্ভ পরিপূর্ণ হল, অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি করছে।'

'বেশির ভাগ সময় মৌনী অবলম্বন করে থাকেন কেন?'

'বুঝলি না, জ্ঞান-বিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়। যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি এসব বোধ থাকে। যখন ঠিক ঠিক এক জ্ঞান হয় তখন চুপ। ত্রৈলঙ্গস্বামীর সেই অবস্থা। ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় দেখিস নি? প্রথমটা খুব হইচই। পেট যত ভরে আসছে ততই হইচই কমে যাচ্ছে। যখন দধি মুণ্ডি পড়ল তখন কেবল সুপ্‌সাপ্‌। আর কোনো শব্দ নেই। তারপরই নিদ্রা-সমাধি।'

মণিকর্ণিকার কাছে বেণীমাধবের ঠাকুরবাড়িতে বাবার অবস্থান। এখনই বয়েস হবে দুশো ষাট বছর। সেই মাসটা ছিল মাঘ। ১৮৪৪ সাল। উত্তর ভারতে চলেছে শৈত্যপ্রবাহ। বারাণসীধাম কাঁপছে। গঙ্গা যেন হিমগম্ভীর। পূর্বদিগন্তে কয়েকটি আলোর রেখায় আঁকা হচ্ছে ভোর। যেন অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো। সেই নম্রআলোয় সদ্য ঘুমভাঙা চোখে পুণ্যার্থীরা দেখছেন, মহাকায় উলঙ্গ এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন অসিঘাটে। বার্তা রটে গেল ক্রমে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব। পর্বতকায় এমন অতিমানব পূর্বে কেউ দেখেনি কোনোদিন। শিবভূমিতে ত্রৈলঙ্গ মহারাজের সেই আবির্ভাব। অলৌকিক ঐশী শক্তির বিকাশ।

ক্রমে তিনি 'সচল বিশ্বনাথ'—আর্তজীবের অশেষ বন্ধু।

ঠাকুর বসেছিলেন, উঠলেন। আঙুলে নস্যির টিপ তখনো ধরে আছেন। সামনে সামান্য ঝুঁকে অবাক বিস্ময়ে আবার দেখছেন, পর্বতের মতো বিশালকায় এক মহামানব। 'হ্যাঁ যথার্থ পরমহংসের লক্ষণসকল বর্তমান, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।' দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

॥ দুই ॥

কেদারঘাটের ওপর পাশাপাশি দুটি বাড়ি। কেদারঘাট অতি সুন্দর। প্রশস্ত সোপানশ্রেণী ধাপে ধাপে নেমে গেছে গঙ্গায়। বাড়ি দুটি মথুরবাবু ভাড়া নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে এক আধজন নয়, বিশাল এক বাহিনী।

মথুরবাবু বসে আছেন প্রসন্ন মনে। খুব আনন্দ। পরিপূর্ণ একটি তীর্থযাত্রা। অদূরে বসে আছেন ঠাকুর। পাশে হৃদয়। ঠাকুরের মুখখানি ঐশ্বরিক আনন্দে উদ্ভাসিত। মাঝে মাঝে দু'-হাতের মৃদু মৃদু তালি। মথুরামোহন তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছেন, ঠাকুর যেখানে আনন্দ সেখানে। সৎ, চিৎ, আনন্দ—এই তিন যেখানে পূর্ণমাত্রায় মিলিত, তিনিই ঈশ্বর। মথুরবাবু বুঝেছেন, ঠাকুরের সেবার জন্যেই এবারে তার জন্ম।

ঠাকুর হঠাৎ ভাবভঙ্গ করে বললেন, 'ও মথুর! কাল যে আমার আধ মণ ক্ষীর চাই।'

'কি করবে? অতটা ক্ষীর!'

'বাবাকে খাওয়াব। ত্রৈলঙ্গস্বামীকে আমি ক্ষীর ভোজন করাব। পাওয়া যাবে না?'

'ক্ষীর মালাইয়ের রাজ্যে ক্ষীর পাওয়া যাবে না!'

মথুরবাবু তাঁর খাস গোমস্তাকে ডেকে পাঠালেন। গোধূলিয়ায় বাবুদের বাঁধা দোকানে আধ মণ ক্ষীরের হুকুম চলে গেল। সকাল বারোটার সময় চালান আসবে! মণিকর্ণিকার বাবার ভোগ হবে কাল।

সকাল। ক্রমশই রোদের তাপ বাড়ছে। কাশীতে রোদের যেমন প্রকোপ, চড়া গ্রীষ্ম, সেই রকম শীতও। খালি পায়ে বালির ওপর

দিয়ে হাঁটা যায় না। সূর্যদেব মধ্যগগনে দীপ্যমান। যেন একটি শোভাযাত্রা। ক্ষীরের হাঁড়ি, ক্ষীরভাণ্ড হাতে মথুরবাবুর কর্মচারিরা। পরিধানে শুদ্ধবস্ত্র। তাদের আগে আগে ঠাকুর আর হৃদয়। রোদে বালি এমনি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য—সেই বালির ওপরেই সুখে শুয়ে আছেন ত্রৈলঙ্গ মহারাজ। কোনো হুঁশ নেই। শরীর বোধ নেই। [কেউ বলেন পায়েস। কেউ বলেন ক্ষীর] ঠাকুর সামনে বসে মধুর গলায় ডাকলেন, 'বাবা, ওঠো।'

মৌনী মহারাজ চোখ মেলে তাকালেন। দুটি চোখে সুদূরের দৃষ্টি। সেই উত্তপ্ত বালির ওপর উঠে বসলেন। দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণাকালী কাশীর বিশ্বেশ্বরকে ক্ষীর খাওয়াচ্ছেন। যেমন করে মা ছেলেকে খাওয়ায়। ঘিরে দাঁড়িয়েছেন ভক্তজন। ঠাকুরের দু-চোখে ভাবাশ্রু। এ কেমন দৃশ্য—না, ব্রহ্ম ব্রহ্মকে ক্ষীর খাওয়াচ্ছেন। সীমায় বসে অসীমের লীলা। মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে এক জোড়া চিতা লকলক করে জ্বলছে। অগ্নিজিহ্বা জীবশরীর লেহন করছে। অনিত্যে বসে নিত্যের লীলা। ইতিমধ্যে মথুরামোহন এসে গেছেন। ছত্রধর মাথায় রুপোর ছাতা ধরেছিল। মথুরবাবু হাতের ইশারায় তাকে দূর করে দিলেন। মানুষের মোসায়েবি আর ভাল লাগে না। তাঁর চোখের সামনে ভাসছে অনন্তের চিত্র। তরতরে জাহ্নবী ভেসে চলেছে সাগরে। দগ্ধনীল আকাশে পায়রার ঝাঁক। ভাসমান পানসির গাঢ় ছায়া। কত জাতির স্ত্রী-পুরুষের স্থান। চিতার ধূম দীপ্ত আকাশে ধূসর জটার মতো উদ্গীর্ণ। স্বজন হারানোর রোদন। শিশুদের হর্ষ-চিৎকার। মথুরামোহন ঘোরে এগিয়ে চলেছেন। ধাপে ধাপে নিচে নামছেন। উত্তপ্ত বালিতে পা রাখলেন। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন জরির লপেটো। একজন কর্মচারি সঙ্গে সঙ্গে বুকে তুলে আঁকড়ে ধরল জুতোজোড়া। অন্নদাতা প্রভুর পাদুকা। মথুরামোহনের দেহবোধ চলে গেছে। এমন পূজা আর কি কখনো দেখা যাবে! রানীর কথা মনে পড়ছে। রাসমণি নৌকার বহর নিয়ে যাত্রা করেছিলেন, কাশীধামে যাবেন। দক্ষিণেশ্বর হয়ে গেল তাঁর বারাণসী। দুই কাশীর দূত তাঁর রামকৃষ্ণবাবা। মথুরামোহন ঠাকুরের পাশটিতে বসেছেন বালকের মতো। ত্রৈলঙ্গ মহারাজার চোখে আকাশের মতো স্নিগ্ধ হাসি। ঠোঁটে ক্ষীর চিহ্ন। যেন

যশোদা মাঈ কানহাইকা ননী খাইয়েছেন।

বেলা দ্বিপ্রহরে কেদারের নিবাসে সকলে ফিরে এলেন। তীব্র শরীরে দীপ্র রোদের মিলনে ঠাকুরের রঙটি হয়েছে জবাফুলের মতো লাল। হৃদয় ভাবছেন, মানুষের ভাগ্য কত ভাল হলে এমন তীর্থভ্রমণের ভ্রমণসঙ্গী হওয়া যায়। এ যেন জীবিতের স্বর্গভ্রমণ!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। মথুরবাবু বসে আছেন। ভাবে বিভোর হয়ে বসে আছেন ঠাকুর। মথুরবাবুর সঙ্গে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এসেছেন কলকাতা থেকে। তাঁরাও বসে আছেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে ঠাকুরের অলৌকিক দর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। সেদিন ঠাকুর দেখেছিলেন পানসিতে দাঁড়িয়ে—'পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পাশে আগমন করছেন আর প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে তুলে তার কানে তারক-ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করছেন—সর্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রী-জগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর পাশে সেই চিতার উপর বসে তার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সব রকমের সংস্কার-বন্ধন খুলে দিচ্ছেন আর নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করে স্বহস্তে তাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করছেন।'

পণ্ডিত রঘুবর শাস্ত্রী বললেন, 'কাশীখণ্ডে মোটামুটিভাবে লেখা আছে এখানে মৃত্যু হলে ৺বিশ্বনাথ জীবকে নির্বাণপদবী দিয়ে থাকেন; কিন্তু কি ভাবে যে দেন তা সবিস্তারে লেখা নেই।' ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার দর্শনেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওই নির্বাণ কিভাবে সম্পাদিত হয়। আপনার দর্শন শাস্ত্র-কথার পারে চলে গেছে, অন্তরঙ্গ গুপ্ত রহস্যে। ধন্য আপনি!'

ঠাকুর হাসলেন। যেন একসঙ্গে অনেক বাতি পরপর জ্বলে উঠল। ঠাকুর খুশি মনে তাঁর সেজবাবুকে বললেন, 'কাল হচ্ছে তো?'

'অবশ্যই হচ্ছে। বারাণসীর সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়েছেন। মাধুকরীর আয়োজনও সম্পূর্ণ। কাল সকালে দেখবে সমাগম কেমন হয়!'

'তাহলে এসো বিষয়কথা ছেড়ে মায়ের নামগান হোক। ঠাকুর গান ধরলেন। চারপাশের দেবালয়ে দেবালয়ে আরতির বাদ্যধ্বনি।

ভাবে মাতোয়ারা হয়ে ঠাকুর গাইছেন ঃ

শিব সঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দ-মগনা,
সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না।
বিপরীত রতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না॥

গানের ভাবাবেশে সবাই স্তম্ভিত। রাত বহে চলেছে নদীর মতো।

॥ তিন ॥

সকালটা ওরই মধ্যে কিছুটা স্নিগ্ধ। ক্রমশই রোদ চড়বে। উত্তাপ বাড়বে। গঙ্গার ওপরটা ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে যাবে। পাথরের উঠনে, বাইরে রাস্তায়, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বিশাল সমাবেশ। ঠাকুর একপাশে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। মথুরবাবু সযত্নে একটি উত্তরীয় পরিয়ে দিয়েছেন। বুকের দুপাশে পরিপাটি দুলছে। মথুরবাবু কেবল ঠাকুরকেই দেখছেন। উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল। তাঁর বাবার ভেতরে গরগরে আনন্দ।

মথুরামোহনের কর্মচারিরা প্রত্যেকের হাতে পরিপাটি একটি করে সিধা তুলে দিচ্ছেন। চাল, ডাল, আটা, ঘি, আনাজ, লবণ, মশলা, মিষ্টান্ন, পরিধেয়, গাত্রমার্জনী এবং যথোচিত দক্ষিণা, কাংসপাত্র।

ঠাকুর মাঝে মাঝে বলছেন, 'জয় বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ!' সঙ্গে সঙ্গে সমবেত প্রতিধ্বনি। বারান্দার রেলিং-এ ছাতের কার্নিসে সারি সারি বানর। তারা আজ কোনো অসভ্যতা করছে না। কুতকুতে চোখে দেখছে, উৎসব কেমন জমেছে!

দ্বিপ্রহর বেলায় সব ফাঁকা হয়ে গেল! সব কোলাহল নীরব। মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা! সব ঠিক আছে তো!' ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'এই তো সবে শুরু!'

ঠাকুর হঠাৎ বললেন, 'মথুর! আমাকে একটা কোদাল জোগাড় করে দিতে পারবে?'

বিস্মিত মথুরবাবুর প্রশ্ন, 'কোদাল? কোদাল দিয়ে কি করবে?'

'সে আমার একটা ইচ্ছে !'

'তুমি কি কোদাল পাড়বে ? তোমার ওই নরম মাখমের মতো হাত ! ছাল-চামড়া উঠে যাবে যে !'

'দেবে তো দাও, না দেবে না দাও।'

মথুরবাবু রহস্যভেদ করতে না পেরে ডাকলেন তাঁর বাজার সরকারকে, 'বাবাকে একটা কোদাল এনে দাও, যেখান থেকে পারো !'

কোদাল ওই বাড়িতেই ছিল ! যেন ঠাকুরের জন্যেই ছিল। কোদাল পেয়ে ঠাকুরের মহা আনন্দ। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন হৃদয়। ঠাকুর বললেন, 'নে, কোদালটা নে। চল, চল, কাজটা করে আসি !'

কি কাজ, কোথায় কাজ ! দুজনের একজনও জানেন না। আদেশ, আদেশ। দুজনে গটগট করে রাস্তায়। হৃদয়ের কাঁধে কোদাল ! সোজা পালকিতে ! হৃদয় জিজ্ঞেস করলেন, 'যাবে কোথায় ?'

'কোথায় আবার, মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে।'

'সে চলো, কোদালটা কী করবে ? চিতা পরিষ্কার ? তোমার খেয়ালের তো অন্ত নেই !'

ঠাকুর রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'চল না, দেখবি তখন !'

মণিকর্ণিকার ঘাটের সেই চিহ্নিত জায়গাটিতে বসে আছেন ত্রৈলঙ্গস্বামী। মেঘশূন্য আকাশ। অফুরন্ত রোদ। ঝকঝকে গঙ্গা। পালকি থেকে নেমে ঠাকুর এগোচ্ছেন। হৃদয় পেছনে। কাঁধে কোদাল। বুকের কাছে ঠাকুরের হাত দুটি জপের ভঙ্গিতে, তালুর ওপর তালু ! ঠাকুর এগোচ্ছেন ! কোনো হুঁশ নেই। হৃদয়ের ভয় হচ্ছে, পড়ে না যান !

স্বামীজির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিরাট শিশুর সামনে আর এক শিশু। বাবা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, হাতে ধরা নস্যির ডিবেটি তুলে দেখালেন। ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'কাঁহাঁ হোগা ?'

স্বামীজি ইশারায় ঠিক পাশের একটি স্থান দেখালেন। একটা পাথর ছুঁড়ে দিলেন। ঠাকুর হৃদয়কে বললেন, 'ঠিক ওই জায়গায় দু কোদাল মাটি ফেল।'

'কি হবে ওখানে ?'

'বাবার ইচ্ছে, ওখানে একটা ঘাট বাঁধিয়ে দেবেন।'

ঠাকুরের ইচ্ছা। হৃদয় পাশের জায়গা থেকে মাটি কেটে, দু-কোদাল মাটি সেই পাথরের ওপর ফেললেন। সবাই অবাক হয়ে দেখছেন। একপাশে নিশ্চেষ্ট উপবিষ্ট ত্রৈলঙ্গ মহারাজ। অদূরে বুকের ওপর হাত দুটি জোড় করে স্থির একটি নিশানের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যোতির্ময় উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল। আর গঙ্গার পাড়ে লম্বা, চওড়া, সুপুরুষ এক যুবক। হাতে কোদাল। মাটি ফেলছেন। কেউ তেমন জানল না, সুদূর দক্ষিণেশ্বরের এক মহাসাধক, বারাণসীর আর এক মহাসাধকের কাঙ্ক্ষিত ঘাটের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করছেন।

মথুরামোহন ঠাকুরকে অনুসরণ করে এসেছেন। ঠাকুর জানেন না। অনেকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে দেখছেন তিনি। ব্যাপারটা কী। ইতিহাস তৈরী হচ্ছে নাকি? ধাপে ধাপে নেমে গেলেন ঠাকুরের পাশটিতে। হুঁশ নেই তাঁর। সামনে প্রবাহিণী পবিত্র গঙ্গা। চোখে সেই ছায়া। চোখে বইছে শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গা। এমন একটা পবিত্র দৃশ্যের সাক্ষী হতে পেরে মথুরামোহন ধন্য।

হুঁশ আসা মাত্রই ঠাকুর ফিরে তাকালেন, 'মথুর! তুমি?'

'কি হচ্ছে বল তো!'

'বারাণসীর গঙ্গার তীরে তোমার রামকৃষ্ণের দু-কোদাল মাটি। এর ওপর উঠবে ত্রৈলঙ্গ মহারাজের বাঁধান ঘাট। পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে ওপরের দিকে উঠে যাবে। ওপরে আরো ওপরে, আরো, আরো ওপরে!'

চোখে জল চিক্‌চিক্ করছে। ত্রৈলঙ্গ মহারাজ হাসছেন। মৌনী মহাদেব! নস্যির ডিবেটি তুলে ইঙ্গিত করলেন—এক টিপ নাও। ঈশ্বরকে শ্বাসে নাও। মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের কালীপূজা ॥

জানবাজারের সেরেস্তা। সকাল দশটা কি এগারোটা। জমিদার মথুরামোহন অতি মনোযোগে হিসেব-পত্তর দেখছেন। দারোয়ান এসে জানাল, 'হুজুর দক্ষিণেশ্বরের মন্দির থেকে একজন এসেছে, বলছে, জরুরি দরকার।'

মথুরবাবু ফার্সির নলটা ঠোঁটে লাগাতে লাগাতে বললেন, 'নিয়ে এস।'

বৈশাখ সবে শুরু হয়েছে। বাতাসে রোদের হলকা। ঘামতে ঘামতে সামনে এসে জোড় হাতে দাঁড়ালেন। দক্ষিণেশ্বর এস্টেটের খাজাঞ্চিমশাই। মথুরামোহন রাশভারি মানুষ। রানী রাসমণির ডান হাত। সুদক্ষ জমিদার। রানীর এস্টেটের আয় আর পরিমাণ দুটোই বাড়িয়েছেন।

মথুরামোহন বললেন, 'বসুন। কি এমন জরুরি! ঘামতে ঘামতে ছুটে এলেন। সবই তো ঠিক চলছে, দেখে এলুম সেদিন। ভাণ্ডারে মা তো কোনো অভাব রাখেননি। কম্পানির সঙ্গে পঞ্চবটীর জমি দখল নিয়ে যে ঝামেলা সে তো আমরা আদালতে বোঝাপড়া করব। ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদনকে ব্রিফ দিয়ে দিয়েছি। বড়রকমের কোনো গোলমাল তো দেখা দেবার কথা নয়। মায়ের সেবায় রানীমা তো কোনো কৃপণতা রাখেন নি!'

খাজাঞ্চিমশাই ইতিমধ্যে শীতল হয়েছেন কিছুটা। ভেবে নিয়েছেন, কি ভাবে, কেমন করে বলবেন। বেশ দুঁদে মানুষ। লোক চরাতে জানেন।

খাজাঞ্চিমশাই খুব মৃদুস্বরে বললেন, এটা তাঁর একটা কায়দা। নালিশ করে কারো ক্ষতি করতে চাইলে এই গলা বেরোয়।

খাজাঞ্চিমশাই বললেন, 'সেজোবাবু, আসল কথা হল, অত সাধের অমন মন্দিরে মা কি শেষ পর্যন্ত থাকবেন?'

ঠোঁট থেকে নল সরিয়ে মথুরবাবু সোজা হয়ে বসে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'থাকবেন না তো যাবেন কোথায়! রানীমাকে স্বপ্ন দিয়ে এলেন। এত কাণ্ড করে, ঘটা করে মন্দির প্রতিষ্ঠা হল! ব্রাহ্মণরা তো রাজিই হচ্ছিলেন না মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। মা বাক্সবন্দী

হয়ে গরমে ঘামছেন। রানীমাকে আবার স্বপ্ন, কি রে রাসমণি, আমি কি বন্দীই থাকব ? মায়ের কৃপায় বিধান দিলেন কামারপুকুরের রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মশাই। সেই অনুষ্ঠানের তো সাক্ষী আছেন আপনারা ! তাহলে ! সমস্যাটা কোথায় ?'

'আজ্ঞে, রামকুমারমশাইয়ের মৃত্যুর পর পুজোর ভার যার ওপর দিলেন…'

মথুরবাবু ভারী গলায় বললেন, 'ছোট ভট্‌চাজকে আপনারা সহ্য করতে পারেন না, কেন বলুন তো ! গদাধর চাটুজ্যে আপনাদের পাকা ধানে মই দিয়েছে ?'

'ছি, ছি, সে কি কথা ! তা নয়। ব্যাপারটা খুব ভয়ের। আপনি জানেন, মা কালীর পুজো অতি কঠিন কাজ। সামান্য ভুল-ত্রুটিতেই সর্বনাশ হয়ে যায়। সেখানে এত অনাচার। আপনাদের বিরাট পরিবার, মন্দিরে আমরাও আছি, এভাবে চললে মায়ের কোপে তো নির্বংশ হতে হবে।'

মথুরবাবু খাড়া হয়ে বসে বেশ রাগের গলায় বললেন, 'অনাচার, অনাচার ! কি অনাচার।'

'আজ্ঞে, ছোট ভট্‌চাজ যা করছে, সেটা পুজো নয়। এমন পুজো, কোনো শাস্ত্রে নেই। ওটা পাগলামি। একে তো মূর্খ, ক-অক্ষর গো-মাংস, ওকে দিয়ে ঘেঁটু পুজো, মনসা পুজো হতে পারে, তন্ত্রের দেবী মা কালীর পুজো হয় না।'

মথুরবাবু বললেন, 'অনাচারের ফিরিস্তিটা শুনি।'

'শুনুন তাহলে। শিউরে উঠবেন। গদাধরের ভাগনে হৃদয় আমাকে বলার পর, আমি যা দেখেছি তার কতক কতক আপনাকে বলছি। সেদিন দেখলুম, মায়ের সামনে বসে বোধ হয় সংকল্প করার চেষ্টা করছিল, শেষটায় সেটা কি দাঁড়াল, জবা আর বেলপাতা অবদি ঠিক আছে, তারপরেই সর্বনাশ।'

মথুরবাবু ঝট্ করে বললেন, 'কার সর্বনাশ !'

খাজাঞ্চিমশাই ভড়কে গিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে আমাদের সর্বনাশ ! নিজের মাথায় ঠেকাল, তারপর বুকে, সর্বাঙ্গে, এমন কি পায়ে ! তারপর সেই ফুল, বেলপাতা পড়ল মায়ের পায়ে। নিজের পায়ে ঠেকানো ফুল মায়ের পায়ে নিবেদন করার কথা কোন শাস্ত্রে আছে

সেজবাবু !'

মথুরবাবু ঠোঁটে ফার্সির নল লাগাতে লাগাতে বললেন, 'হুম্ ।'

'আজ্ঞে, এ তো সামান্য, এর পরে যা হল, শুনলে অবাক হবেন। মন্ত্র-টন্ত্র কিছুই নেই। আসনে বসেই আছে, বসেই আছে, হঠাৎ টলতে টলতে উঠলেন তিনি, বুক চোখ টকটকে লাল। টলতে টলতে সোজা গিয়ে উঠে পড়ল মায়ের সিংহাসনে। একবার কল্পনা করুন। মানুষ হয়ে দেবীর সিংহাসনে! মায়ের দাড়ি ধরে আদর হচ্ছে, গান হচ্ছে, রঙ্গ-রসিকতা, ফস্টি-নস্টি গল্প। শেষে মায়ের দুটো হাত ধরে নাচ। একে পুজো বলে! এরপর দেখবেন কোন্ দিন মূর্তিটুর্তি নিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মাকে নিয়ে এ কি ছেলেখেলা!'

মথুরবাবু পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, 'আর আছে?'

'আছে মানে? কত শুনবেন! নিজের এঁটো খাওয়ান!'

মথুরবাবু মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সে আবার কি?'

'ওই তো। মাকে ভোগ নিবেদন হচ্ছে। সেজবাবু, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদনের শাস্ত্রীয় নিয়মটা কী। অন্নব্যঞ্জনাদি সাজিয়ে দিয়ে, দরজা বন্ধ করে মাকে নির্জনে রাখা। বৃন্দাবনে আধঘণ্টা, বারাণসীতে একঘণ্টা, এক এক মন্দিরে এক এক নিয়ম। এখানে উনি কি করছেন?'

'কি করছেন!'

'উন্মাদরা যা করে। থালা থেকে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন খাবলা মেরে তুলে নিয়ে দুদ্দাড় করে সিংহাসনে উঠে মায়ের মুখে ঠেকিয়ে বলতে লাগল, 'খা, মা খা! বেশ করে খা!' এর পরে শুরু হল ঢং, মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে, 'আমি খাব মা! আমি খাব মা। আচ্ছা, এই দেখ, আমি খাচ্ছি!' এইবার নিজে খানিক খেয়ে সেই এঁটো খাবার মায়ের ঠোঁটে ঠেকিয়ে দিল। আবার শুরু হল ঢং. টেনে টেনে সুর করে বলতে লাগল, 'আমি তো খেয়েছি, এইবার তুই খা।' আপনিই বলুন সেজবাবু, একে পুজো বলে না অনাচার! এরপরেও মন্দিরে মা আছেন? না চলে গেছেন। কবে তিনি পালিয়ে বেঁচেছেন!'

মধ্যবয়সী, পাকাপোক্ত চেহারার খাজাঞ্চিমশাই মহাউৎসাহে,

প্রায় অভিনয়ের ঢঙে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের নামে নালিশ করে চলেছেন। সেজোবাবু এই খ্যাপাটে যুবকটিকে বড় শ্রদ্ধা, বড় আদরের চোখে দেখেন। কত্তার মন একটু টলিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। আমাদেরই মতো রাসমণির এস্টেটের সাধারণ একজন কর্মচারি হয়ে অতিরিক্ত খাতির পাবে তা তো হতে পারে না। তোমার ভট্‌চাজগিরি আমরা ঘোচাবই ঘোচাব।

মথুরবাবু গম্ভীর একটি হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'আরো আছে?'

খাজাঞ্চিমশাই সোৎসাহে বললেন, 'নেই আবার। একদিন ভোগ নিবেদনের সময় একটা বেড়াল কালীঘরে ঢুকে ম্যাও ম্যাও করছে, অমনি আপনার ছোট ভট্‌চাজ, 'খাবি মা খাবি মা' বলে ভোগের অন্ন তাকে খাওয়াতে লাগল। উঃ, কি অনাচার, কি অনাচার! ভয় করে, আমাদের যা হয় হোক, আপনাদের পরিবারের ওপর মায়ের যেন কোপ না পড়ে!'

মথুরবাবু তেরছা চোখে মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শেষ হল?'

'আজ্ঞে, আর একটা বলে শেষ করে দিচ্ছি। সে যে কি ভয়ংকর শুনলেই বুঝতে পারবেন। আমার কাছে খবর এল, রাতে মাকে শয়ন দিতে গিয়ে ছোট ভট্‌চাজ নিজেই মায়ের রুপোর পালঙ্কে শুয়ে আছে। ছুটে গেলুম, আড়াল থেকে শুনলুম, মায়ের সঙ্গে ঢং হচ্ছে, 'মা মা আমাকে কাছে শুতে বলচিস, তা এই তো শুয়েচি!' সেজবাবু! ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েচে একবার ভাবুন। পাগল হয়ে গেছে, ঘোর উন্মাদ। চিকিৎসার প্রয়োজন, অবশ্য পাগলের কোনো চিকিৎসা নেই। দু'চার দিন থম্‌ মেরে থাকে তারপর আবার যে কে সেই?'

মথুরবাবু বললেন, 'শেষ হয়েছে?'

'আপাতত!'

'বেশ তাহলে আসুন এখন। আমি হঠাৎ একদিন তদন্তে যাব।'

॥ দুই ॥

কে কি বলছে, কে কি করছে, কোনো ব্যাপারেই কোনো হুঁশ নেই সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের। প্রশ্ন এই, যিনি অবতার, সাধারণ মানুষের

মতো তাঁর এত সাধন-ভজন, এত অনুসন্ধান কেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে পরে। তবে এইটুকু বলা যায়, শ্রীরাম, শ্রীচৈতন্য আদি সব অবতারকেই মানুষের মহৎ ভূমিকা পালন করতে হয়েছে, মানুষের পরিণতি বরণ করে নিতে হয়েছে।

সেবক ভাগনে হৃদয় মামার দিকে নজর রেখেছেন। মামার আচরণে শঙ্কিত। রাতে একছিটে ঘুম নেই মামার চোখে। হৃদয় একই ঘরে থাকেন। যখনই জাগেন, শোনেন, মামা অদৃশ্য কারো সঙ্গে ভাবের ঘোরে কথা কইছেন। বিভোর হয়ে গান শোনাচ্ছেন! হঠাৎ চলে যাচ্ছেন ঘরের বাইরে, পঞ্চবটীর ঘোর অন্ধকারে।

'মাঝ রাতে তুমি কোথায় যাও মামা? ওই ঘোর জঙ্গলে! কি আছে ওখানে?'

'পঞ্চবটীর পাশের জঙ্গলে নিচু খন্দে একটা আমলকী গাছ আছে, তার তলায় বসে ধ্যান করি। শাস্ত্রে কি বলে জানিস, আমলকীতলায় যে যা কামনা করে ধ্যান করে তার তাই সিদ্ধ হয়।'

হৃদয় শুনলেন। ঠিক করলেন মামাকে ভয় দেখাতে হবে। ওটা সাপের আড্ডা! ছোবল মারলে মামা বাঁচবে! পর পর কয়েক রাত মামার এই নিশাধ্যানের সময় হৃদয় আমলকীতলার আশে-পাশে ঢিল ফেলতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বুঝতে অসুবিধে হল না, এ হৃদয়ের কাজ!

কৌতূহলী হৃদয় একদিন গভীররাতে আমলকীতলায় গিয়ে দেখলেন, মামা দিগম্বর। গভীর ধ্যানে সুখাসীন। এ কি দৃশ্য! পাগল হয়ে গেল না কি! এগিয়ে গেলেন ধ্যানমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, 'মামা! এ কি হচ্চে? এটা কি? পৈতে কাপড় সব ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসে আছ?'

কোনো উত্তর নেই। নিশ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ।

অনেক ডাকাডাকির পর হুঁশ এল। তিনি প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 'তুই কী জানিস। ধ্যান করতে হয় এইরকম পাশমুক্ত হয়ে। জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি, অভিমান—এই অষ্টপাশে বদ্ধ হয়ে আছে। পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়'—এই অভিমানের চিহ্ন, একটা পাশ। এখন সব ফেলে দিয়েছি, ধ্যান শেষ হলে আবার সব পরে নোবো।'

রানীর উদ্যানটি ভারি সুন্দর। অতি ভোরে সেই উদ্যানে ঘুরে ঘুরে ফুল তুলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এ-দৃশ্য হৃদয়ের চোখে রোজই পড়ে। ফুল তোলাটা বোঝেন, কিন্তু অত কথা কার সঙ্গে! মামা কখনো হাসছে, কখনো রঙ্গ পরিহাস, আদর আবদার। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছেন। মাকে দেখছেন। মন্দির ছেড়ে নেমে এসেছেন বালিকার মূর্তি ধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন, গাছের আড়ালে আড়ালে। কখনো বা ডেকে বলছেন, 'এই যে গো. এখানে একটা মস্ত জবা পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে।'

প্রচুর ফুল। একটি একটি করে বেছে, গেঁথে তৈরি করলেন মালা। মাকে পরাবেন, মাকে সাজাবেন। দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। একের পর এক গান। মা শুনছেন, মা হাসছেন, মা বলছেন বা, বা। এই গান শুনে রাসমণি মুগ্ধ। যে শোনে সেই মুগ্ধ হন, দেবকণ্ঠের সংগীত। দর্শনার্থী ভক্তজন, যাঁরা মন্দিরে দেবদর্শনে আসেন তাঁরা অবাক হয়ে দেখেন এই দিব্য দেবপুরুষকে। ইনি যে সাধারণ কোনো পূজারী নন তাঁরা বুঝতে পারেন।

মন্দিরের অন্যান্য কর্মচারিরা মহাবিরক্ত—আরে ভাই! পুজোর তো একটা শেষ আছে। এ দেখি চলছে তো চলছেই। নিজের মাথায় একটি ফুল চড়িয়ে আসনে পাথর প্রতিমার মতো বসে আছে অনড়। মিনিটের হিসেব নয়. ঘণ্টা। দু'ঘণ্টা তো কিছুই নয়, তিন, চারও হতে পারে। পুজোর আর সব অঙ্গ কখন হবে, কখন হবে ভোগ-রাগ, আরতি!

মথুরবাবু এসেছেন তদন্তে! দাঁড়িয়ে আছেন আড়ালে। দেখছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর গা ছমছম করে উঠল। এ তো পাথরপ্রতিমা নয়, জীবন্ত। দিব্যবিভায় আলোকিত হচ্ছে মন্দির-গর্ভ। শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলছেন মায়ের সঙ্গে—মান অভিমানের কথা। 'ফুলটা পা থেকে ফেলে দিলি? পছন্দ হল না। রামপ্রসাদ দিলে পছন্দ হত! তাই না!

মথুরবাবু দেখলেন ছোট ভট্টাচার্য কাঁদছেন—অঝোরে জল ঝরছে দু চোখে। বলছেন, তাহলে একটা গান শোনাই।

গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না।
ও দুটি চরণ বিনা আমার মন অন্য কিছু আর জানে না॥

মথুরামোহনের চোখে জল। শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় নিঙড়ানো আবেগে জমিদার মথুরামোহনের বিষয়ী মনও গলেছে।

গান থামিয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'কি হল? খিদে পেয়ে গেল। দাঁড়াও। ব্যস্ত হলে চলে। পুজো কি শেষ হয়েছে। পুজোর আগে ভোগ দিলে লোকে কি বলবে। হ্যাংলা! মা! তোরও বদনাম আমারও বদনাম। দাঁড়াও, চট্ করে উৎসর্গটা করে দি।'

এপাশে, ওপাশে কিছু ফুল পড়ল। ঘণ্টাও বাজল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'রোজ রোজ আমি খাইয়ে দিতে পারব না, আমাকে কে খাইয়ে দেয়। আমি এখন বড় হয়ে গেছি, নিজে নিজেই খাই। ওঃ অভিমান। রোজই তো খাইয়ে দি, আজও দোবো। একটু দেখে দিতে হবে তো। কাল তো দাঁতে একটা কাঁকর পড়েছিল।'

মথুরবাবু লক্ষ্য করছেন, সম্পূর্ণ বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণ, যেন এক বালক এক বালিকার সঙ্গে খেলা করছে। মান, অভিমান, আবদার, তিরস্কার। পরম যত্নে আহারাদি করিয়ে জলপান করান হল, তারপর একটি ছাঁচি পান।

মথুরবাবু যা দেখলেন, দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিদিন যা দেখেন, মা শ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলো করে সাক্ষাৎ আহারে বসেছেন। মার হাত দুটি কমলোজ্জ্বল, সৌম্যাৎসৌম্য হাস্যদীপ্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রমুখ।

অন্তরালে দাঁড়িয়ে মথুরবাবু বেশ বুঝলেন, এ সাধারণের সাধারণ পুজো নয়। বুঝলেন, ভট্টাচার্য জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হয়েছেন। শ্রীমন্দির দেবপ্রকাশে যথার্থই জমজম করছে। আনন্দের হিল্লোল বইছে। সেই আনন্দের স্পর্শে মথুর অভিভূত। চোখে জল। মথুরামোহন দূর থেকে ভক্তিপূতচিত্তে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও তাঁর অপূর্ব পূজারীকে বার বার প্রণাম করতে করতে মনে মনে বলতে লাগলেন, 'এতদিনের পর দেবীপ্রতিষ্ঠা সার্থক হল, এত দিনের পর শ্রীশ্রীজগন্মাতা সত্য সত্যই এখানে আবির্ভূত হলেন, এতদিনে মার পূজা ঠিক ঠিক সম্পন্ন হল।'

মথুরামোহন যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই মন্দিরের কর্মচারিদের কিছু না বলেই জানবাজারে ফিরে গেলেন। সেই

রাতেই রানীকে অভিভূত মথুরামোহন বললেন, 'অদ্ভুত পূজারী এই গদাধর। দেবীকে জাগিয়ে ছেড়েছে। মৃন্ময়ী আজ চিন্ময়ী। স্বচক্ষে দেখে এলুম।' পরের দিনই মন্দিরের প্রধান কর্মচারির ওপর তাঁর নিয়োগ এল, 'ভট্টাচার্য মহাশয় যেভাবেই পূজা করুন না কেন, তাঁহাকে বাধা দিবে না।'

অবতারের পূজা, সে শুধু প্রথা নয়, প্রমাণ। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। তিনি সর্বস্থানে নিরাকার, নির্গুণ, অদ্বৈত, যাঁর কোনো দ্বিতীয় নেই। বিশ্ব জুড়ে যত 'তুমি'-র খেলা, সবই সেই এক 'আমি' বড় 'আমি', 'বিগ আই'। এক 'আমি' স্ব-ইচ্ছায় বহু হচ্ছেন। এ দর্শন মায়ারই খেলা। সুতরাং মায়ার রাজত্বে ঢুকে 'আমিই ব্রহ্ম' বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হবে। গা-জোয়ারি কথা হবে। এমন কথা তিনিই বলতে পারেন, যাঁর উপলব্ধি হয়েছে, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হয়েছে। সমাধিতে না গেলে সে দর্শন হয় না। তাহলে উপায়। যাঁরা নিচের স্তরে রয়েছেন তাঁদের কি করে সত্য লাভ হবে। জগৎ-চক্রান্তে তাঁরা কি পিষে যাবেন!

দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির শক্তি-সাধন-কেন্দ্রে সেই পরীক্ষাই হোক। শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা ভক্তি আর বিশ্বাসের পরীক্ষা। জল নিরাকার, ভক্তি-হিমে জমে বরফ, তখন সাকার, আবার জ্ঞানের উত্তাপে গলে নিরাকার! ব্রহ্মেরই মায়া। মায়া স্বয়ং আদ্যাশক্তি, জগৎকারণ, সৃজন, পালন আর বিনাশের অধিকর্ত্রী। তাহলে কার পূজা? সেই জগৎকারিণী, সৃজনপালিনী মহামায়ারই পূজা। তিনি কে? তিনিই তো ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদের সেই ঋষি-দর্শনটি যাচাই করে নিতে হবে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জানীতি শান্ত উপাসীতে।' ঋষি একটি রহস্যময় শব্দ ব্যবহার করেছেন—'তজ্জলান'। তজ্জ, অর্থাৎ তা থেকে জাত। তল্ল, অর্থাৎ তাতেই লীন বা অবসিত। তদন, অর্থাৎ তাতেই স্থিতি বা অবস্থিত। ব্রহ্মেরই আধারে জন্ম, জীবন, লয়। শিব আর শক্তি। মহাকাল আর খণ্ড-কাল। শক্তি ছাড়া শিব শব। শক্তির সাহায্যেই কর্ম। শুভ আর অশুভ উভয়ই শক্তি। মায়ারও দুটি রূপ—বিদ্যামায়া, অবিদ্যা-মায়া। অবিদ্যামায়া বন্ধনের কারণ, বিদ্যামায়া মুক্তির কারণ।

ঠাকুরের পূজা হল, 'কাতর প্রার্থনা'। সৃষ্টি-রহস্যের দ্বার

উন্মোচনের জন্যে 'কাতর আবেদন'। কোশা-কুশি, ঘণ্টা, প্রদীপ নয়। আরো গভীর অনুসন্ধান। মন্দিরে ভেসে বেড়াচ্ছে হৃদয়-ভেদী কণ্ঠস্বর, 'মা আমার কি হচ্চে, কিছুই বুঝি না ; তোকে ডাকবার মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। যা করলে তোকে পাওয়া যায়, তুই-ই তা আমাকে শিখিয়ে দে। তুই না শেখালে কে আর আমাকে শেখাবে, মা, তুই ছাড়া আমার গতি বা সহায় আর কেউই যে নেই।' শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদছেন, 'মা, আমি তোর শরণাগত বালক। যা বলতে হবে, যা করতে হবে, তা তুইই বলা, তুইই করা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রবিধিসম্মত নিছক পূজা করতে চান না। চাল-কলা-বাঁধা তুচ্ছ বিদ্যা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ভট্টাচার্য বামুনও হতে চান না। রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে মথুরামোহনের দেওয়া স্বাধীনতায় ধর্ম ও দর্শনের পরীক্ষা করবেন তিনি। শাস্ত্র আচারে নেই, বিচারে নেই। শাস্ত্রের ফলিত রূপ দর্শন। আগে দেখব তারপর বলব, আগে বাজাব তারপর বাজব, আগে শুনব তারপর শোনাব।

মা, আমি তোমাকে দেখব। নিজে না দেখলে, পরে নরেন এসে যখন উগ্র প্রশ্ন করবে, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তখন আমি কেমন করে বুক ঠুকে উত্তর দোবো, হ্যাঁ করেছি, মাইরি বলছি করেছি, এই ঠিক যেমন এখন তোকে দেখছি। কেমন করে তখন আমি বলব, তিনটান এক করতে পারলেই তাঁর দর্শন পাওয়া যায়।

'মা, আমায় দেখা দে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'সে কি অবস্থা আমার, 'হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ; জলশূন্য করবার জন্যে লোক যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াতে থাকে, মনে হত হৃদয়টাকে ধরে কে যেন সেইরকম করছে।'

সেই একটি দিন, বিশেষ দিন। সামনে প্রথাগত পূজার আয়োজন। মন্দিরের বাইরে অতিপরিচিত প্রত্যহের জীবনচিত্র। প্রবহমান গঙ্গা। স্নানার্থী, পুণ্যার্থী। কুসুম উদ্যানে ভাসমান বহু বর্ণের প্রজাপতি। মন্দিরশীর্ষে বাক্যালাপরত কপোতের দল। শ্রীরামকৃষ্ণ মাকে শ্রীরামপ্রসাদের গান শোনালেন। তারপরেই মনে হল, হয় আজই দর্শন, না হয় মরণ। মা! তুই, রামপ্রসাদকে দেখা

দিলি, আমাকে দেখা দিবি না! তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই।'

'মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময়ে সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!'

তারপর! 'বাইরে কি যে হয়েছে, কোন্ দিক দিয়ে সেদিন ও তার পরদিন গেছে, তার কিছুই জানতে পারিনি। জমাটবাঁধা অননুভূত আনন্দের স্রোতধারায় অবগাহন। বিশ্বগ্রাসী জগন্মাতার দ্বারা গ্রাসিত। 'ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই। আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ সমুদ্র!—যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।'

এমন দিব্যদর্শন তিনি নরেন্দ্রনাথকেও করিয়েছিলেন পরে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুভাব ধারণ করেছেন ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা শুরু করেছেন, মন্দির, মসজিদ থেকে ধর্মকে বের করে মানবজীবনের উদারতায় প্রতিষ্ঠার পরম চেষ্টা করছেন, যখন তিনি নিজের নিবিড় সাধনায় যাচাই করে নিতে পেরেছেন' যত মত তত পথ। যে-সত্যটি শিষ্য নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হয়ে বিশ্বধর্মসভায় প্রতিষ্ঠিত করবেন, রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং / নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥ মানুষের নানা রুচি। রুচি অনুসারেই পথ নির্বাচন। কোনো পথ সরল, কোনো পথ বক্র। কিন্তু যেমন নদী। সব নদীরই এক গতি যেমন সমুদ্র, সেইরকম সব মানুষেরই গতি ভগবান। নরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়া যুবক, ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। মূর্তি, ধর্ম, পূজা, স্তব মানেন না। প্রথা মানেন না। ধর্মের কুসংস্কারকে ঘৃণা করেন। প্রবল আস্তিক তাই নাস্তিক বলে মনে হয়। তাঁর অনুসন্ধান, ঈশ্বর আছেন, না নেই। থাকলে তাঁর রূপ কী! মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব! না কল্পনা! আষাঢ়ে গল্প!

শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করার আগে বাজাচ্ছেন—এই লোকটি কে? পাগল! বায়ুরোগগ্রস্ত! ভণ্ড! মিথ্যাবাদী! ঈশ্বরকে দেখেছেন! মা কালী রূপধারণ করে খেলা করেন। বলে, বলে দেন, এইটা কর, ওইটা কর। বাগানে ফুল তোলেন সঙ্গে সঙ্গে, গাছের আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলেন! নিবেদন করা ভোগ দেখিয়ে বলেন, তুই আগে খা, তারপর আমাকে খাওয়া! বলেন, রুপোর পালঙ্কে আমার পাশে শো! আবার এই সাধকই অদ্ভুত প্রত্যয়ে বলেন, সবই ব্রহ্ম। নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য। অযৌক্তিক কথা।

কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবদেবী নরেন্দ্রনাথ মানেন না, আবার সবই ব্রহ্ম এমন বিশ্বাসও তাঁর নেই। 'সবই ব্রহ্ম' শুনে নরেন্দ্রনাথ ঠাট্টা করছেন, 'হ্যাঁ' তাও কি কখনো হয়? তাহলে ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও!' শ্রীরামকৃষ্ণ মনে মনে বললেন, 'দাঁড়া নরেন, তোর হচ্ছে! এতকাল ঢ্যামনাই দেখেছিস, গোখরোর ছোবল তো খাসনি!' স্থির দৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে আছেন। নরেন্দ্রনাথ ভাবছেন, পাগল আজ আবার কি পাগলামি করে! শ্রীরামকৃষ্ণ ঝটিতে এগিয়ে এসে নিজের দক্ষিণপদ নরেন্দ্রনাথের অঙ্গে স্থাপন করলেন। মুহূর্তের মধ্যে আলোড়ন। নরেন্দ্রনাথ দেখছেন—'দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল, আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে—অতি নিকটে! সামলাইতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—ওগো, তুমি আমার একি করলে? আমার যে বাপ-মা আছেন!'

শ্রীরামকৃষ্ণ খল খল করে হাসছেন। নরেন্দ্রনাথের বুকে হাত রেখে বললেন, 'তবে এখন থাক। একেবারে কাজ নেই, কাল হবে!'

মন্দির অভ্যন্তরে মায়ের কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণের একই দর্শন। অনন্ত ব্রহ্মে আমি-সত্তার নিরঞ্জন। নিরাকার জ্যোতিঃ সমুদ্র। মা ডুবিয়ে দিলেন, আছড়ে ফেললেন। প্রাণটুকু রইল, বোধ রইল না। অর্জুনও দেখেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ,

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্ক দ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥

অর্জুন অরূপের সেই ভয়ংকর দ্যুতিতে একটি রূপ দেখেছিলেন, অরূপের রূপ। কিরীট, গদা আর চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও দিবাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ্য, অপ্রমেয়স্বরূপ তোমার অদ্ভুত মূর্তি আমি সর্বদিকে দেখছি, তুমি যে কত বড় তার ইয়ত্তা করা যায় না।

অরূপেরও রূপ আছে। নিরাকারেও সাকার আছে। সংজ্ঞাহারা শ্রীরামকৃষ্ণ যখন জ্ঞানের জগতে ফিরছেন, তখন কাতরকণ্ঠে বলছিলেন, 'মা, মা।' দেখেছিলেন রূপ—মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি। তিনি হাসছেন, তিনি কথা কইছেন, অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

সম্ভব! মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করা সম্ভব। কল্পনা নয় বাস্তব। সাধক আর তাঁর সাধনা। আমি পেয়েছি। আমি 'নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্যসত্যই নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দিরদেউলে মার দিব্যাঙ্গের ছায়া কখনো পতিত হইতে দেখি নাই। আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি মা পাঁইজর পরিয়া বালিকার মতো আনন্দিত হইয়া ঝমঝম শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপর তলায় উঠিতেছেন। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্যসত্যই মা মন্দির দ্বিতলের বারাণ্ডায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখনো কলিকাতা, কখনো গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।'

প্রথম প্রথম ধ্যানপূজাদিকালে দেখতেন, চোখের সামনে মায়ের পাষাণময়ী মূর্তিতে এক জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান। যতই অগ্রসর হলেন, বিশ্বাস, ভক্তি আর আকুলতার পথে, তখন মন্দিরে প্রবেশ করে পাষাণময়ীকে আর দেখতেই পেতেন না। দেখতেন, যাঁর চৈতন্যে সমগ্র জগৎ সচেতন, তিনিই চিদ্‌ঘন মূর্তি ধারণ করেছেন। বরাভয়কর-সুশোভিতা জগন্মাতা।

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥

সর্বপ্রাণীকে গ্রাস করেন 'মহাকাল'। মহাকালকে তুমি 'কলন' বা গ্রাস কর—তাই ত মা! তুমি 'কালিকা', 'পরাশক্তি', 'আদ্যাশক্তি-স্বরূপিণী'।

শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাস্নান করে কালীঘরে এসেছেন। পূজার আসনে বসেছেন। মার পাদপদ্মে ফুল দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে নিজের মাথাতেও দিচ্ছেন। গভীর ধ্যানে চলে যাচ্ছেন। জ্যোতির্ময় মুখে চমকে উঠছে অলৌকিক হাসি। অনেকক্ষণ পরে তিনি আসন থেকে উঠে পড়লেন। ভাবে বিভোর! নৃত্য করছেন। মাঝে মাঝে বলছেন, 'মা বিপদনাশিনী গো, বিপদনাশিনী।' মাকে গান শোনাচ্ছেন,

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও মা করতালি॥

মা, তুমি আদিভূতা সনাতনী। তুমি শূন্যরূপা শশিভালি। মা, তোমার ত্রিনয়নে চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি। সেই ত্রিনয়নে তুমি কালের রচনা এই বিশ্বচরাচর নিরীক্ষণ করো মা। শশিসূর্যাগ্নিভি নেত্রৈ।

কালীঘরের কাছাকাছি গেলে সাধারণ মানুষের গা ছমছম করে। হৃদয় বলছেন, সে এক অনির্বচনীয় দিব্য আবেশ। রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। জামাতা মথুরামোহন তদন্ত সেরে এসে বলেছেন, একটা কাণ্ড সেখানে হচ্ছে বটে! মা জেগে উঠেছেন। গদাধরকে আগে থেকেই শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন রাসমণি। তাঁর গান, তাঁর পূজা, ভক্তি, আবেগ, আকুতি রানীকে মুগ্ধ করেছিল। গদাধরের বিচার! শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের পা ভেঙে গেল। দেবালয় প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যে এই দুর্ঘটনা। আগের দিন গেছে জন্মাষ্টমী, সেদিন নন্দোৎসব। মধ্যাহ্নের বিশেষ পূজা, ভোগরাগাদি হয়ে গেল। পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন দিয়ে গোবিন্দজীকে বুকে করে নিয়ে যাচ্ছেন শয়ন দিতে, মেঝেতে জল পড়েছিল, পা হড়কে বিগ্রহসহ পড়ে গেলেন। বিগ্রহের একটি পা ভেঙে গেল। সর্বনাশ! মহা অমঙ্গল! নানা পণ্ডিতের নানা মত। সিদ্ধান্ত, ভগ্ন বিগ্রহ বিসর্জন দিয়ে নতুন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা। এই একমাত্র শাস্ত্রীয় বিধান। মথুরামোহন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন। রানীমাতাও উপস্থিত। ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, সে কি গো! তোমার

জামাইয়ের পা ভেঙে গেলে তাকে বিসর্জন দিয়ে নতুন জামাই আনবে! গোবিন্দজীর পা আমি এমন ভাবে জুড়ে দোবো, তোমরা বুঝতেই পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় দু'জনেই অভিভূত! দু'জনেই চিনেছেন, কৃপা করে কে এসেছেন লীলা সাজাতে।

সেদিন মায়ের মন্দিরের বাইরে শ্বেতপাথরের দালানে মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে রানীমা বসে আছেন। শ্বেতশুভ্র বস্ত্র পরিহিতা রাসমণিকে বড় শুদ্ধ দেখাচ্ছিল। দেবীর মতো। শ্রীরামকৃষ্ণ অদূরে বসে রানীকে গান শোনাচ্ছেন। মন্দির চাতালে ঝকঝকে একটি দিন শিশুর আনন্দে খেলা করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ রানীমার অত্যন্ত প্রিয় গানটি গাইছেন,

কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব্ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তারা
তারা কি তোর এমনি ধারা।
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অমনি করে॥

সামনে পূজার আয়োজন। পুষ্পমালায় বিভূষিতা, সালংকরা মা জগদম্বার স্মরমুখ. জ্যোতির্ময় তন্ময় পরিবেশ। রাসমণির আঙুলে জপের মালা। কোথাও কোনো বেসুরো ব্যাপার নেই। গান হঠাৎ থেমে গেল। ঝটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত তাঁর কোল ছেড়ে উঠল। রানীকে এক চড়, তিরস্কারের গলা—'কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ চিন্তা!' চমকে উঠলেন রাসমণি। সত্যই ত! আঙুলে মালা নাচছে, কানে গান ঢুকছে, মনে মামলার চিন্তা ঘুরছে! ধরে ফেলেছেন দেব-পুরুষ। অন্তর্যামী তুমি গদাধর। তুমিই আমার প্রকৃত গুরু, শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুবর হে! রানী থতমত। 'মন্দিরের কর্মচারী, রানীর পরিচারিকারা, সকলে হই-চই করে তেড়ে এল। দ্বারপাল শশব্যস্তে ঠাকুরকে ধরতে ছুটল। বাইরের কর্মচারীরাও মন্দিরে কিসের এত গোল, মহাকৌতূহল, ছুটে এসেছে।'

জনতা থমকে আছে। যাঁদের নিয়ে এত গোলযোগ, তাঁরা নির্বিকার। শ্রীরামকৃষ্ণের গম্ভীর মুখে মৃদু হাসি। রানী এমন বিপরীত মিলন কখনো দেখেননি। রানীর মুখ, অপরাধী বালিকার

মুখ। মৃদু স্বরে বললেন, অপরাধ হয়ে গেছে। পরক্ষণেই তাঁর হুঁশ হল। মারমুখী কর্মচারীর দল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার রানী। গম্ভীর গলায় আদেশের সুরে বললেন, 'তোমরা চলে যাও।'

বিষয়ে ভগবান আছেন, ভগবানে বিষয় নেই। পূজা মানে মগ্নতা। পরবর্তীকালে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনুগামীদের বলতেন, আমি সব রকম করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি, পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে সমাধি। ইষ্টে লয় হয়ে যাওয়াই জপ, তপ, পূজা। মগ্ন হয়ে, লগ্ন হয়ে জপতপ পূজা না করলে সবই পণ্ডশ্রম। তাঁকে দর্শন করতে চাই—মুখে বোলো না। মনের আবেগে চোখের জলে বলো। মাগ ছেলের জন্যে লোকে ঘটিঘটি চোখের জল ফেলে, ঈশ্বরের জন্যে এক ফোঁটা জল কজন ফেলে! চাই তো চাইই চাই। ডাকাতে রোক। মারব, কাটব, লুটব, নয়তো মরব। যাঁহা কাম হুঁয়া নহি রাম। দিবা আর রজনী কেমন করে এক জায়গায় থাকে! গান গেয়ে বলতেন, মনে বাসনা থাকিতে কি হবে বলো না, জপিলে তুলসীমালা। দুটো জিনিস পরপর রয়েছে। সামনে একটা পেছনে একটা। এটা বিষয় ওটা ভগবান। এটাকে না সরালে ওটাকে পাওয়া যায়! কাম-কাঞ্চন কলির মায়া। ভস্ম করে ফেলো। তার আগে নিজের মন যাচাই করো—সত্যিই কি তুমি চাও। যদি উত্তর আসে—হ্যাঁ, আসনে বোসো 'ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। তবে নিষ্ঠা থাকা ভাল। নিষ্ঠাভক্তির আর-একটি নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। যেমন এক ডেলে গাছ, সোজা উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি যেমন পাঁচ ডেলে গাছ। গোপীদের এমনি নিষ্ঠা যে বৃন্দাবনের মোহনচূড়া, পীতধড়া পরা রাখালকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভালবাসবে না। মথুরায় যখন রাজবেশ, পাগড়ি মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে তখন তারা ঘোমটা দিলে। আর বললে, ইনি আবার কে? এঁর সঙ্গে আলাপ করে আমরা কি দ্বিচারিণী হব?'

সব এক। কিসের বিদ্বেষ! 'বিদ্বেষভাব ভাল নয়—শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়। পদ্মলোচন বর্ধমানের সভাপণ্ডিত ছিল; সভায় বিচার হচ্ছিল—শিব বড় না ব্রহ্মা বড়।

পদ্মলোচন বেশ বলেছিল—আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নেই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই।'

॥ তিন ॥

রানীকে চপেটাঘাত করেও শ্রীরামকৃষ্ণের পূজারীর পদ বহাল রইল, বরং কর্তাদের কাছে খাতির শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। মন্দিরের কর্তাভজা কর্মচারীরা বড় মুষড়ে পড়লেন। এদের মধ্যে কেউ ভাঁড়ারের জিনিস সরায়। কেউ ভোগ আর প্রসাদ সরিয়ে মেয়েমানুষের বাড়িতে দিয়ে বাড়তি সোহাগ আদায় করে।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই কালীতে রূপান্তরিত। শাস্ত্রে একটি নির্দেশ আছে, 'দেবভূত্বা দেবং যজেৎ।' যাঁর পূজা করছ তাঁর ভেতরে চলে যাও। লীন হয়ে যাও। আমি-তুমি ভেদ মুছে দাও। ধীরেধীরে পূজা ও সেবার কালাকাল বিচার লোপ পেল। ভাবাবেশে সর্বদা বিভোর। যখন যেমন ইচ্ছে হচ্ছে, সেইভাবে জগন্মাতার সেবা করছেন। যেমন পূজা না করেই ভোগ নিবেদন করে দিলেন। ধ্যানে তন্ময় হয়ে ভুলেই গেলেন, কে পূজারী, কার পূজা। ফুল আর চন্দনে নিজেই সাজলেন। নিজেকেই নিজে অঞ্জলি দিলেন। ভেতরে আর বাইরে নিরন্তর জগদম্বার দর্শন চলেছে। ওই তন্ময়তার সামান্যতম হ্রাস হলেই তিনি ব্যাকুল হয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়তেন, মা কেন তোকে দেখতে পাচ্ছি না। মাটিতে মুখ ঘষছেন, ছটফট করছেন, ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে কাঁদছেন। কি ভয়ংকর যন্ত্রণা! প্রাণ বুঝি বেরিয়ে যায়! শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝি রোধ হয়! সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। রক্তা-রক্তি কাণ্ড! কোনো হুঁশ নেই, জলে পড়ছেন কি আগুনে। পরক্ষণেই মুখে অদ্ভুত জ্যোতি, অদ্ভুত—উল্লাস পেয়েছি মা, দেখা পেয়েছি, কোথায় লুকিয়েছিলিস এতক্ষণ?

সেদিন তিনি পূজায় বসেছেন। কয়েকদিন থেকেই মথুরামোহন চিন্তিত। বৈধী পূজা আর কি পারবেন ছোট ভট্‌চাজ্‌! অনেকেই বলছেন, এ সবই ঊর্ধ্ববায়ুর লক্ষণ। কবিরাজের শরণ নাও। হৃদয় মামার জন্যে আরো বেশি চিন্তিত। এত বড় মন্দির! এত নাম! এত ভক্ত সমাগম। কার অত ধৈর্য আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে

থাকবে, কখন পূজা শেষ করে প্রসাদ দেবেন ধ্যানস্থ, আত্মহারা ভট্টাচার্য !

মথুরবাবু আর হৃদয় দাঁড়িয়ে আছেন। পূজার আসনে শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁরা দেখছেন, সংকল্প হল। মাথায় একটি ফুল। শরীরের দিকে ইদানীং আর কোনো যত্ন নেই। মাথায় জটা, মুখে চাপ দাড়ি। বুক সিঁদুরের মতো লাল। ভাবছেন মথুরামোহন, এইবার কি হয়! পুজো এইবার কোন্ দিকে যায়! ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ আসন থেকে উঠে পড়লেন। মায়ের দিক থেকে মুখ ঘোরাতেই দেখলেন, মথুরবাবু, পাশে হৃদয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন জানতেন, যেন তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বললেন, 'এসেচো।'

হৃদয়ের হাত ধরে পুজোর আসনে বসিয়ে দিলেন, 'শোনো সেজবাবু! আজ থেকে হৃদয় পুজো করবে। মা বলছেন, হৃদয়ের পুজো আমি নোবো, একই ভাবে নোবো। যেমন তোর পুজো আমি নি। আজ থেকে হৃদয় পূজারী!'

বিশ্বাসী মথুরামোহন এটিকে দৈবাদেশ বলে মেনে নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে, মনে, মুখে সর্বত্র জগদম্বা। তিনি কালীময়। দুটি ঘটনায় জমিদার, শুধু জমিদার নন বাঘা জমিদার। প্রয়োজনে লেঠেল দিয়ে শত্রুকে ভবপারে চালান করতে পারেন। মন উতলা হলে মেছুয়াবাজারে সেরাসুন্দরী লছমীবাঈয়ের কাছে যেতেও বাধা নেই। দুটি ঘটনা নয়, দুটি দর্শনে মথুরামোহন পাকা সিদ্ধান্তে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মনুষ্যদেহধারী ভগবান। অষ্টসখীর এক সখী রাসমণি কালীবাড়ি তাঁরই জন্যে করেছেন। আর মথুরামোহন জন্মেছেন এই দেবমানবের সেবার জন্যে।

ঘটনা দুটির একটি হল, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মথুরামোহন বিজ্ঞানবিশ্বাসে প্রাকৃতিক নিয়মের কথা বলছিলেন, ঈশ্বর নিজের তৈরি নিয়ম মানতে বাধ্য, ঈশ্বর হলে কি হবে! প্রকৃতির নিয়ম ভাঙা তাঁর পক্ষেও দুঃসাধ্য। যে-নিয়ম তিনি একবার করে দিয়েছেন তা রদ করার ক্ষমতা তাঁরও নেই। তখন নিয়মই ঈশ্বর।

দক্ষিণেশ্বরের কুঠিবাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পায়চারি করতে করতে শুনছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে করলে সে তখনই তা রদ

করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।'

মথুরামোহন বললেন, 'মানতে পারলুম না। অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব কথা। লালফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, সাদাফুল কখনো হয় না ; কেননা তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন। কই লালফুলের গাছে সাদাফুল তিনি এখন করুন দেখি ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন, তাও করতে পারেন।'

মথুরামোহন সর্বজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, 'মানতে পারলুম না।'

পরের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ ঝাউতলায় গেছেন শৌচে। হঠাৎ দেখছেন একটা লাল জবাফুলের গাছে, একই ডালে দুটো ফেঁকড়িতে দুটো ফুল—একটি লাল, আর একটি ধপধপে সাদা, এক ছিটেও লাল দাগ নেই তাতে। গাছের ডালটা বাতাসে দুলতে দুলতে যেন তাঁকে ডাকছে। তোমার কথার সত্য-প্রমাণের জন্যে আমরা প্রস্তুত। যাও, মথুরামোহনকে দেখাও। জগতে ঈশ্বরের আইন নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছাই বড়।

মথুরামোহন কুঠিবাড়িতে যথোচিত জাঁক করে বসেছিলেন আরামকেদারায়। সামনে মেহগনিকাঠের পালিশ করা বিলিতি টেবিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ডালটা মথুরামোহনের সামনে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই দেখ।'

মথুরামোহন অবাক হয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'আশ্চর্য! হ্যাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তাঁর আইন নয়, তাঁর ইচ্ছা!'

দ্বিতীয় ঘটনা, মথুরামোহনের অলৌকিক দর্শন। একদিন মথুরবাবু তাঁর কুঠিবাড়িতে, কর্মচারিরা যেটিকে 'বাবুদের কুঠি' বলতেন, তারই একটি ঘরে একা আপন মনে বসে আছেন। সময়টা সকাল। ভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত লম্বা বারান্দায় গোঁভরে পায়চারি করছেন। মথুরবাবু যেখানে বসে আছেন, সেখান থেকে ঠাকুরকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। মথুরবাবুর মনে দু'ধরনের খেলা চলেছে। কখনো ঠাকুরের বিষয়ে ভাবছেন, কখনো ভাবনায় আসছে

বিষয়ের বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরামোহনকে লক্ষ্য করেননি। তিনি এক গোঁয়ে, নিজের ভাবে একবার এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছেন, আবার ওপাশ থেকে এপাশে আসছেন।

মথুরামোহন ধনী, মানী, বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু। ঠাকুরবাড়ির আর রানীর সমস্ত বিষয়ের মালিক আর শ্রীরামকৃষ্ণ তখনো সামান্য দরিদ্র দেবলব্রাহ্মণ, যাঁকে সাধারণে বলে নির্বোধ, উন্মাদ, অনাচারী। পুজোটাও ভাল করে করতে পারে না। তিনঘণ্টা ধরে আরতিই করছে। মন্ত্র জানে না, নিজের মাথায় ফুল চড়িয়ে একঘণ্টা আসনেই বসে রইল চোখ বুজিয়ে। দিব্যি ঘুম। বললে ধ্যান। চটকা ভাঙতেই পুজোর আগেই ভোগনিবেদন। মায়ের আগেই নিজে খাবলা মেরে খানিক খেয়ে নিয়ে এঁটো হাতটা মায়ের মুখে ঠেকিয়ে—খা মা খা। এর নাম খামাখা পুজো। এমন মানুষ, এমন উন্মাদ, এমন ভণ্ড কেমন করে বাবুর সুনজরে পড়ল। পুজো না জানুক গ্রামের শ্মশানে বসে বশীকরণ মন্ত্রটা ভালই রপ্ত করেছে। ঈর্ষাকাতর কর্মচারীর দল। একমাত্র সহায়, মামার ভবিষ্যৎ-ভাবনায় সদা উদ্বিগ্ন, ভাগনে হৃদয়।

পদচারণ-রত শ্রীরামকৃষ্ণ পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেলেন। পায়ের কাছে প্রণত মথুরামোহন। পা-দুটি জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। ত্রস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'এ কি? তুমি এ কি করচ? তুমি বাবু, তুমি রানীর জামাই। তোমায় এমন করতে দেখলে, লোকে কি বলবে? স্থির হও। ওঠ।'

বিশ্বাসী, ভক্ত, মথুরামোহন বিশ্বাসের আজ মিলিত ইষ্ট দর্শন হয়েছে। সেই মিলনের আধার শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁরই শ্রীচরণ দুটি জড়িয়ে ধরে ভূমি-নত মথুরবাবু।

'তুমি এ কি করচ! তুমি বাবু। তুমি রানীর জামাই! ওঠ, ওঠ।'

শান্ত হয়ে মথুরামোহন রহস্য উদ্ঘাটন করলেন, 'বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা। আর যেই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ, দেখচি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথমে ভাবলুম—চোখের ভুল; চোখ ভাল করে রগড়ে ফের দেখলুম—দেখি তাই!

এইরকম যতবার করলুম—দেখলুম তাই।' মথুরামোহন বলছেন আর কাঁদছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভয় পেলেন। মথুর 'বাবা' বলছে। তার কল্যাণ, অকল্যাণের কথা ভাবতেই হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'কই আমি তো কিছু জানি না, বাবু। শোনো, এসব কথা কারোকে বলো না, রানীর কানে গেলে কি ভাববে! ভাববে গুণ-টুন কিছু করেছে!'

'প্রথম থেকেই তোমাকে আমি চিনেছি বাবা। বহুলোকে বহু কথা, বাদ-অপবাদ করেছে, আমি কান দিই নি। আজ আমার বিশ্বাস পাকা হল। তুমিই আমার শিব, তুমিই আমার কালী। আমার ঠিকুজি বিচার করে জ্যোতিষী বলেছিলেন—তোমাকে ঘিরে থাকবে তোমার ইষ্ট কৃপা, এতটাই কৃপা, যে শরীর ধারণ করে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবেন, তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আমার বাবা। আমি তোমার সেবক পুত্র।'

১৮৫৭ সাল। সেই থেকে মথুরামোহনের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হল, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা।

পূজার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে শুরু হল শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-সাধনা। শাস্ত্র-সত্য আগে যাচাই তবেই না অভ্রান্তশক্তিতে বলা যাবে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' যত মত তত পথ। মথুরামোহন বললেন, তুমি সাধন করে যাও—দৃকপাতহীন সাধন—আর আমি তোমার সেবা করি।

অবতারের সাধনা। সে বড় বিচিত্র! সাধারণ সাধকের দুঃসাধ্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই। পূর্ববর্তী অবতারগণ যা করে গেছেন, শাস্ত্র যা রেখে গেছেন, তা মেলানো। মিলে গেলে বলা—শাস্ত্র অভ্রান্ত। দেবতারা অভ্রান্ত। যে যা করছে, যে ভাবে করছে সব ঠিক।

এইবার সকলে আসতে শুরু করলেন—অবতারেরও গুরু হন। তাঁরা ভ্রমরের মতো ছুটে আসেন প্রস্ফুটিত অবতার কুসুমের কাছে—যেমন দেব-শক্তিতে দুর্গারূপ, তাঁদেরই অস্ত্রে সশস্ত্রা মহিষাসুরমর্দিণী। তমোনাশী।

এলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী। করিয়ে গেলেন বিষ্ণুক্রান্তায় চৌষট্টি তন্ত্রের সাধন। সিদ্ধ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পর পর হয়ে গেল সখ্য,

বাৎসল্য, মধুরভাবের সাধন। সে বড় বিচিত্র পরিক্রমা। যোগ নয় সংযোগ-সাধন। রামায়েৎ সাধু জটাধারী এসে রামমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। যাবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে গেলেন তাঁর দীর্ঘকালের পূজিত রামলালার বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভের জন্যে শুরু হল রাধারানীর উপাসনা। পেলেন দর্শন। সংযোগ হল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে।

এলেন পুরী সম্প্রদায়ের বেদান্তী সাধক তোতাপুরী। সন্ন্যাস দিলেন। বেদান্তসাধনে ব্রহ্মদর্শন হল। এরপর ইসলাম সাধন ও সিদ্ধি। নবদ্বীপে নৌকায় শ্রীশ্রীচৈতন্যের দর্শনলাভ। তাহলে আর কি কোনো পূজা নেই। আছে! জীবন্ত কালীপূজা।

সে-বর্ণনায় রোমহর্ষণ হবে।

১৮৭৩ সাল। জুন মাস। কেউ জানলেন, জানলেন দুজন। ভাগিনেয় হৃদয় ও ভাইপো দীনু। নিজের ঘরে নিভৃতে রহস্য-পূজার আয়োজন হল এঁদের সাহায্যে। সেদিন মন্দিরে ফলহারিণী কালীপূজা। জননী সারদা, শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি তখন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁকে বলে রেখেছিলেন, পূজাকালে তুমি আসবে!

রাত তখন নটা। আয়োজন সম্পূর্ণ। মা এলেন। ঠাকুর পূজোয় বসলেন। মা জানেন না—কার পূজা, কেন এই স্বতন্ত্র পূজার আয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ পূজকের আসনে বসলেন। পূর্ব-মুখে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণ দিকে আলপনা শোভিত পিঁড়ি। কে বসবেন সেখানে! কোন দেবী!

শ্রীরামকৃষ্ণ আবাহন জানালেন সারদাদেবীকে—উত্তরমুখী হয়ে পিঁড়িতে বোসো।

সামনের কলসের মন্ত্রপূত জলে যথাবিধানে শ্রীশ্রীমাকে বারবার অভিষিক্ত করলেন। শোনালেন অভিষেক মন্ত্র। তারপর প্রার্থনা—হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরি মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।

এরপর, শ্রীশ্রীমার অঙ্গে সমস্ত মন্ত্রের যথাবিধানে ন্যাস করে সাক্ষাৎ ৺দেবীজ্ঞানে তাঁকে পূজা করলেন এবং ভোগ নিবেদন। নিবেদিত ভোগের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁর মুখে দিলেন। শ্রীশ্রীমার

বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত, সমাধিস্থ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন।

কেউ কোথাও নেই। রুদ্ধদ্বার। ঘৃত প্রদীপের নিমীলিত শিখা। ধুনো, গুগ্‌গুল, চন্দনের সুবাস। বাইরে বয়ে যায় রাতের অন্ধকার নদী। দু'জনেই সমাধিস্থ। রাত্রীর তৃতীয় যামে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্যদশায় দেবীকে আত্মনিবেদন করলেন। বিল্বপত্রে নিজের নাম লিখে, সেই বিল্বপত্র-সহযোগে নিজের সাধনকালে ব্যবহৃত আভরণও রুদ্রাক্ষের যাবতীয় মালা ও অন্যান্য উপকরণ, জীবন সাধনার সমস্ত ফল এবং নিজেকে দেবীপাদপদ্মে সমর্পণ করে দিলেন।

'এ পূজা পূজার ইতি আর দেব দেবীমূর্তি কভুনা
পূজিলা পরমেশ।

যেন পূজা শ্রীশ্রীমার পরম চরম সার পরিণাম সকলের শেষ॥

শ্রীশ্রীমা ষোড়শীপূজাকালে এতই আবিষ্ট ছিলেন জানতেই পারলেন না, কি হয়ে গেল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নতুন কাপড় পরিয়েছেন, প্রণাম করে তাঁর পায়ে জপের মালা সমর্পণ করেছেন। যে-মা কোনো দিন মাংস খেতেন না, তাঁকে প্রসাদী মাংস 'মহাপ্রসাদ' খাইয়েছেন।

॥ উপসংহার ॥

শেষপূজা এখনো হয়নি। সে পূজা হল শ্যামপুকুর বাটীতে 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা'। যে-কথাটি তিনি প্রায়ই বলতেন, যাবার আগে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব। গলায় দুরারোগ্য ক্যানসার। ভক্তকুল বিষণ্ণ। ভীষণ এক শূন্যতা এল বলে। শ্রীরামকৃষ্ণদীপ নির্বাপিত হবে। নরশরীর ছেড়ে ভাবশরীর পরিগ্রহ করবেন। তার ছিঁড়ে যাবে, সুর ভেসে থাকবে। জীবন, সাধনা, বাণী, লোককল্যাণ, বিশ্বের আধ্যাত্মিক জাগরণ, চৈতন্যের প্রার্থনা, প্রেম, মানবসেবা, 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা'। এমন একটা ধর্ম যার পরিকাঠামোয় সব আছে। যে ধর্মে সাধু, গৃহী, শয়তান সকলেরই আশ্রয় আছে। যে-ধর্মের সুর 'বর্জন নয় গ্রহণ'। পূজা কার? গণদেবতার। মন্দির একটাই—মানবমন্দির। কোন্ বিগ্রহ? মানব-

কল্যাণ—সুখ, শান্তি, আনন্দ, সহমর্মিতা। আত্মা কি? সমষ্টী।

কে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ?

অপেক্ষা করো। দিন আসন্ন। এবার কালীপূজা কবে পড়েছে?

৬ নভেম্বর ১৮৮৫।

মাস্টার কোথায়?

আজ্ঞে এই যে আমি।

শোনো, এ বছর শনিবার কালীপুজো পড়েছে। শনির ইষ্ট কালী। তুমি সকালে ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দিরে যাবে। মাকে পুষ্প, ডাব, চিনি, সন্দেশ দিয়ে সকালেই পূজা দেবে, আর ডাক্তার সরকারের জন্যে কিনে আনবে রামপ্রসাদের আর কমলাকান্তের গানের বই।

মাস্টারমশাই আদেশ পালন করে কালীপুজোর দিন সকালে ঠনঠনের মন্দির থেকে শুদ্ধবস্ত্রে, নগ্নপদে, প্রসাদ হাতে শ্যামপুকুর বাটীতে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দোতলার দক্ষিণের ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র, কপালে চন্দনের ফোঁটা। ঠাকুর পাদুকা পরিত্যাগ করে ভক্তিভরে প্রসাদ নিলেন। বললেন, 'বেশ প্রসাদ'। মাথায় ঠেকালেন। মাস্টারমশাইকে বললেন, 'আজ কালীপূজা, কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার বলে এস। প্যাঁকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞেস কর দেখি।'

কালীপূজার দিনের নিশ্ছিদ্র, নিকষ কালো রাত। তারার মালা পরেছে। দোতলার সেই দক্ষিণের ঘরে পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ। আসনে পূজক শ্রীরামকৃষ্ণ। ধূপ দীপের সৌরভে আর আলোতে কক্ষটি মন্দির। তিরিশেরও বেশীসংখ্যক ভক্ত সমবেত। তাঁরা বসে আছেন নীরবে। ঠাকুরকে দেখছেন। আদেশের প্রতীক্ষা করছেন। ঠাকুর বসে আছেন নিশ্চল। তাঁরাও বসে আছেন পূজা শুরুর প্রতীক্ষায়। ভেবেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে যেমন করতেন, 'আপনাকে আপনি পূজা' সেই রকমই হয়ত করবেন।

প্রহর চলে যায়, ধূপ পুড়ে যায়, অপেক্ষা দীর্ঘতর হয়। ঠাকুর নিথর নিশ্চল। কোনো পূজা নেই, কোনো আদেশ নেই। জবা, বিল্বদল, সাজানো নৈবেদ্য অপেক্ষায়। ঠাকুরের পূজার আসন তাঁর শয্যা। হঠাৎ গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের মনে একটি তরঙ্গ খেলে

গেল—উনি পুজো করবেন কি আমরাই ওঁকে পুজো করি।

কথাটি মনে উদয় হওয়া মাত্রই পাশে বসে থাকা গিরিশচন্দ্রের কানে কানে বললেন।

'বলেন কী?' আনন্দে, উল্লাসে আত্মহারা গিরিশই তখনই পুষ্পপাত্র থেকে ফুলচন্দন তুলে জয়মা, জয় মা! বলে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন।

ঠাকুরের সর্বাঙ্গ শিহরিত, গভীর সমাধিমগ্ন। মুখে দিব্য-জ্যোতি, অধরে দিব্যহাসি। হাত দুটি ধীরে ধীরে উঠছে দুপাশে, ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে বরাভয় মুদ্রা। ভক্তরা স্পষ্ট দেখছেন, 'জ্যোতির্ময়ী দক্ষিণামূর্তিতে দেবী সহসা তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন।'

দাও, দাও অঞ্জলি দাও ভক্তগণ। জয় মা, জয় মা! শ্রীরামকৃষ্ণই কালী, কালীই শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরে কালীই কালীর পুজো করেছিলেন। শ্যামপুকুরবাটী আর এক দক্ষিণেশ্বর!

গিরিশচন্দ্র কাঁদছেন আর গাইছেন,

কে রে নিবিড় নীল-কাদম্বিনী সুর সমাজে।
কে রে রক্তোৎপল-চরণযুগল হরউরসে বিরাজে॥

সময়কে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সময়! পড়ে আছে ইতিহাস।

॥ শিব ও তাঁর শক্তি ॥

বৈষ্ণব অথবা শাক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা মাকে কখনো স্ত্রী বা বধূমাতা সহধর্মিণী বলতেন না, বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি। ধর্মের জগতে সেইটিই ছিল প্রথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, শক্তি ছাড়া শিব শব। পড়ে আছেন শব হয়ে শক্তির পদতলে। এই যে পুরুষ আর প্রকৃতির মিলন, এইটিই হল সৃষ্টিতত্ত্ব। আদ্যাশক্তি মহামায়ার এই হল খেলা। তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।

তন্ত্রসাধনার কালে পঞ্চবটীতে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার মোহিনীমায়া দর্শন করেছিলেন। এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠে ধীর পায়ে পঞ্চবটীতে একেবারে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ক্রমে দেখলেন, ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা; পরে দেখলেন, ঐ রমণী তাঁর সামনেই সুন্দর কুমার প্রসব করে তাকে কত স্নেহে স্তন্যদান করছে, পরক্ষণেই দেখলেন, রমণী কঠোর করাল-বদনী হয়ে ঐ শিশুকে গ্রাস করে আবার ফিরে গেলেন গঙ্গাগর্ভে। জন্ম এবং মৃত্যু, সৃষ্টি ও লয় পড়ে আছে শক্তির এলাকায়।

ঠাকুর আরো একটি সুন্দর গল্প বলতেন, কিশোর বয়সে গণেশ একদিন খেলা করতে করতে একটা বেড়াল দেখতে পান। বালসুলভ চপলতায় সেটাকে নানাভাবে কষ্ট দিলেন, প্রহার করে ক্ষতবিক্ষত করলেন। বেড়ালটা কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে পালাল। গণেশ তখন শান্ত হয়ে মায়ের কাছে এল। এসে দেখছে, জননী শ্রীশ্রীপার্বতীদেবীর শ্রীঅঙ্গের সর্বত্র প্রহার চিহ্ন। গণেশ তো কেঁদে ফেলেছেন, 'মা তোমার এমন অবস্থা কে করলে মা?' দেবী বিমর্ষ-ভাবে উত্তর দিলেন, 'তুমিই আমার এই দুরবস্থার কারণ।' বিস্মিত গণেশ সজল নয়নে বললেন, 'সে কি কথা, মা। আমি তোমাকে কখন প্রহার করলাম! বা আমার কোন্ দুষ্কর্মের জন্যে অন্যে এসে তোমাকে এইভাবে অপমান করে গেল মা।' জগন্ময়ী শ্রীশ্রীদেবী তখন বালককে বললেন, 'ভেবে দেখ দেখি, কোন জীবকে আজ তুমি প্রহার করেছ কিনা?' গণেশ বললেন, 'তা করেছি, অল্পক্ষণ হল একটা বেড়ালকে মেরেছি।' যার বেড়াল সে-ই মাতাকে এমন

প্রহার করেছে ভেবে গণেশ তখন খুব কাঁদছেন। তখন শ্রীশ্রীগণেশ-জননী অনুতপ্ত বালককে আদর করতে করতে বলছেন, বোঝাচ্ছেন, 'তা নয় বাবা, তোমার সামনে এই যে আমার শরীর, এই শরীরকে কেউ প্রহার করেনি, কিন্তু আমিই যে মার্জারাদি যাবতীয় প্রাণীরূপে সংসারে বিচরণ করছি, সেই কারণেই তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার শরীরে ফুটে উঠেছে। তুমি না জেনে এমন কাজ করেছ। দুঃখ করো না, তবে আজ থেকে মনে রেখ, স্ত্রীমূর্তি-বিশিষ্ট সমস্ত জীব আমার অংশে উদ্ভূত আর পুংমূর্তিধারী জীবসমূহ তোমার পিতার অংশে জন্মেছে—শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেউ নেই, কিছুই নেই।' মায়ের ওই কথাটি গণেশের হৃদয়ে গেঁথে গেল। ফল হল এই—বিবাহযোগ্য বয়স যখন হল, তখন মাকে বিবাহ করতে হবে ভেবে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে অসম্মত হলেন। শ্রীশ্রীগণেশ চিরকাল ব্রহ্মচারী হয়ে রইলেন, আর শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ—এই কথা হৃদয়ে সর্বদা ধারণ করে থাকায় জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হলেন।

এইবার একটি বিশ্লেষণে আসা যাক। আমাদের হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসের উদ্ভব কবে থেকে হল। বেদের ঋষিরা সন্ন্যাসী ছিলেন না। ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মজ্ঞান ধারণের জন্যে ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন। অবশ্যই প্রয়োজন। স্বামীজির কথা উদ্ধৃত করছি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে—'ব্রহ্মচর্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তিমহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। উহা ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি আর কিছুতেই হইতে পারে না। যত মহা মহা মস্তিষ্কশালী পুরুষ দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচর্যবান ছিলেন।

'যোগীরা বলেন, মনুষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে মহত্তম শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে। যাহার মস্তকে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়। মানুষের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়া, কামচিন্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সংযত হইলে সহজেই ওজোরূপে পরিণত হইয়া যায়। পবিত্র কামজয়ী নরনারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন। এই জন্যই সর্বদেশে ব্রহ্মচর্য শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

মানুষ সহজেই বুঝিতে পারিবে, অপবিত্র হইলে এবং ব্রহ্মচর্যের অভাবে আধ্যাত্মিক ভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজ—সবই চলিয়া যায়। এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে-সব ধর্ম-সম্প্রদায় হইতে বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন—সেই-সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

'আমার মনে হয়, কোন জাতিকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে তাকে সর্বপ্রথমে বিবাহের পবিত্রতা ও অবিচ্ছেদ্যতার মধ্যে দিয়ে মাতৃত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব অর্জন করতে হবে!'

তাহলে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য অভিন্ন হল। গার্হস্থ্য ধর্ম ও সন্ন্যাস ধর্মের মধ্যে তৈরি হল বিরাট এক বিভাজন। ভোগ আর যোগ আলাদা হল। গৃহী সংসারী ভোগমার্গী। সংসারী যোগমার্গী। শ্রীভগবান এইবার যোগের বিভিন্নতা ব্যাখ্যা করলেন। সাংখ্যযোগের দর্শন নিয়ে কর্মযোগে এস—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

হে অর্জুন, বেদের কর্মকাণ্ড কামনামূলক ও সংসৃতিদায়ক। অতএব, প্রথমে তুমি নিষ্কাম হও এবং ঈশ্বরার্থে কর্ম কর। সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত ও সদা সত্ত্বগুণাশ্রিত হও এবং যোগ [এখানে যোগের অর্থ হল অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি] এবং ক্ষেমের [প্রাপ্তের রক্ষণের] আকাঙ্ক্ষারহিত ও অপ্রমত্ত হও।

অর্জুন তো সন্ন্যাসী নন। রাজপুত্র, যোদ্ধা। রক্ষা ও প্রজা-পালনই তাঁর রাজধর্ম। একবারও কট্টর সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্যের মতো বললেন না, অর্জুন সব ছেড়ে পালাও।

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

বললেন না। স্বয়ং গোবিন্দ যাঁর রথে, তিনি বারেক বললেন না, ভজ গোবিন্দঃ, ভজ গোবিন্দঃ মূঢ়মতে! বরং, মায়ার মধ্যে বসে মায়াকে চেনবার জন্যে সরাসরি ব্রহ্মজ্ঞান দিলেন,

যাবনর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

সমস্ত অঞ্চলটাই যদি প্লাবনে জলমগ্ন হয়, তাহলে জলের জন্যে কূপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সন্ধানের প্রয়োজন হয় না। যেখানে যাবে সেইখানেই জল, সেইরকম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও পূর্ণোদকস্থানীয়। তার ব্রহ্মচেতনায় বেদোক্ত সকল কাম্য কর্মের ফল অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এইটিকেই একটু অন্য গঠনে বলেছেন, 'বন্যে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের ওপর এক বাঁশ জল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বললেন, ব্রহ্মেরই মায়া। বিভু আর শক্তি জড়িত, যেমন জল আর জলের হিমশক্তি, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি। মায়ার শ্রেণীবিভাগ করলেন, বিদ্যা মায়া আর অবিদ্যা মায়া। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী আর অবিদ্যারূপিণী স্ত্রী।

সন্ন্যাসী নারীর পট পর্যন্ত দর্শন করবে না। পরামর্শটা হল, পালাও, পালাও। শঙ্করের সন্ন্যাসধর্ম কাম জয়ের যে পথ দেখিয়েছে, তা হল ঘৃণা। নারীকে ঘৃণা কর। অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে স্বভাবদুর্গন্ধ নিরন্তকান্তরে। কলেবরে মূত্র পুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥ কামিনী আর কাঞ্চন এই দুই মায়া থেকে দূরে থাকলেই ব্রহ্মজ্ঞান। অতই সহজ! মনের নাশ না হলে ব্রহ্মজ্ঞান আসবে না।

এই সমস্যার সমাধানে এলেন অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। স্ত্রী গ্রহণে তাঁরও যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল। তোতাপুরী যখন সন্ন্যাস দিতে চাইলেন, তখন ঠাকুর সসঙ্কোচে বলেছিলেন, আমি যে বিবাহিত। তোতাপুরী বলেছিলেন, তাতে কি হয়েছে, সেইটাই ত তোমার পরীক্ষা। নিজেকে যাচাই করে নিতে পারবে আরো ভালভাবে। এ যেন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা। নারীকে ত্যাগ নয়, লক্ষ্য কামজয়ী হওয়া। গণেশ আর গণেশজননীর উপাখ্যান বর্ণনা করে ঠাকুর বলেছিলেন, 'রমণীমাত্রে গণপতির মাতৃভাব বদ্ধমূল হওয়ায় তিনি আজীবন ব্রহ্মচারীই থেকে গেলেন। আমারও রমণীমাত্রে ঐরূপ ভাব, সেইজন্য বিবাহিত স্ত্রীর ভেতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার মাতৃমূর্তির সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে পূজা ও পাদবন্দনা করেছিলুম।' শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃত তন্ত্রসাধক ছিলেন। সাক্ষাৎ শিব। বীর, তাই বুক ঠুকে বলতে পেরেছিলেন, রমণীর সঙ্গে থাকি না করি রমণ। কারণ,

আমার সন্তান ভাব। সমস্ত রমণীই আমার মা।

তাহলে বিবাহ কেন? কারণ, দুটো। এক, দশবিধ সংস্কারের একটি সংস্কার বিবাহ। দুই, উদাহরণ। সন্ন্যাস! সে ত সন্ন্যাসীর জন্যে আছেই, গৃহীরাও ঈশ্বর লাভ করতে পারবে, যদি ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকে। তার জন্যে সব ছেড়ে বনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন, অন্তর্বৈরাগ্য, বিশ্বাস এবং ভক্তি। কলিতে নারদীয় ভক্তি। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন,

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥

হে অর্জুন কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই ঈদৃশ আমাকে জানিতে ও স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করিতে এবং আমাতে প্রবেশরূপ মোক্ষলাভ করিতে ভক্তগণ সমর্থ হয়, অন্য উপায়ে নহে। ঠাকুর একটি অবাক স্বীকারোক্তি করেছেন, যার অর্থ হল, সারদা মা যদি অন্যরকম হতেন তাহলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কি হত, তিনি নিজেই জানেন না। মা সারদার শক্তিই ঠাকুরের সাধকজীবনের আচ্ছাদনী বর্ম। যার জোরে ঠাকুর গৃহদুর্গে বসে সাধনভজনের পরামর্শ দিতে পেরেছিলেন।

শ্রীমদ অন্নদা ঠাকুর আর মণিকুন্তলা মা, ঠাকুরেরই পথ অনুসরণ করেছিলেন। সন্ন্যাস অথবা সংসার, এ সংশয় ছিলই। মণিকুন্তলা মা প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার সাধন পথে আমি কী কোনো বাধার কারণ হয়েছি যে তোমাকে সংসার ত্যাগ করতে হবে! 'বল বল কি দোষে দাসীরে ত্যজিতে সংকল্প তব?' 'কে আছে আপন জন? আমা সম প্রিয় তব কে আছে ধরায়?'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি সারদা জননীর সঙ্গে মণিকুন্তলা মায়ের যে-পার্থক্য, সেটি হল, মা জননী ছিলেন স্বয়ং জ্ঞান। ঠাকুরের কথায়, সারদা সরস্বতী। ঠাকুর ব্রহ্মলীন হওয়ার পর সরস্বতী হলেন স্বয়ং শক্তি, জ্যান্ত দুর্গা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সন্তান। কোলের শিশুটি। ধর্মের সিংহ সংসারে অতি অসহায়। জাগতিক কোনো বৈভব নেই, ধন, দৌলত। সাংসারিক কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। এমন কি পরিধানের কাপড়টিও কোমরে ধরে রাখতে পারেন না। এই ফিটবাবু ত, এই দিগম্বর। তার ওপর শরীর!

বারোমাস পেটের ব্যামো। অতটুকু নহবতে হাঁড়িকুঁড়ি, উনুন, বাসন, সেইখানেই মায়ের শয়ন। মাথার ওপর ঝুলছে শিকে। সেখানে হাঁড়িতে জল খলবল জাওলা মাছ। পেটরোগা সন্তানটিকে মা স্বহস্তে ঝোল রেঁধে ভাত খাওয়াবেন। ছেলে যেমন মাকে ভয় পায় ঠাকুরও মাকে ভয় পেতেন! অনেকটা এইরকম, 'না, বাবা, সারদা বকবে।' কি মধুর। মা কোনো কারণে সামান্যতম বিরক্ত হলে, ঠাকুর উতলা হতেন—ওরে! যা যা তোর খুড়িকে শান্ত কর, ও রেগে গেলে সর্বনাশ।

শ্রীমদ তোতাপুরী সেই যে কথাটি বলে গিয়েছিলেন, 'তাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকলেও যার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্ত্রী আর পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলে সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করতে পারেন, তাঁরই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয়েছে; স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান থেকে বহুদূরে রয়েছে।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কী কারণে অনন্য অবতার। অবতারবরীষ্ঠ। অর্থনীতি সমাজতন্ত্রে যেমন সোস্যালিজম এল, ধর্মে যে সোস্যালিজম আনতে গিয়ে মহাপ্রভু মহাভাবে চৈতন্যময় হয়ে একেবারে লীন হয়ে গেলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এইবারে এসে সেটিকে সম্পূর্ণ করলেন। সকলের ধর্ম, চলতে ফিরতে ধর্ম। ঘড়ি যেমন সর্বত্র, সব অবস্থাতেই ঠিক ঠিক, টিক টিক। ঠাকুরের নিজস্ব উচ্চারণে—ধর্মকে 'রেফাইন' করা।

সেই লীলাতেই নিমজ্জিত অন্নদা-মণিকুন্তলা লীলা। সস্ত্রীক সাধনা। শ্রীমদ অন্নদা সর্বত্যাগী গুহাবাসী, কি শ্মশানচারী হতে পেরেছিলেন? কেন হবেন! মানুষের মনোচারী-আত্মনোমোক্ষার্থং —শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে আসছেন যে সেই ভাস্বর সন্ন্যাসী, মূর্ত মহেশ্বর, স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুর যে সব সাজিয়ে এনেছিলেন। পৃথিবী সকলের চেয়ে বড়, সাগর তার চেয়ে বড়, আকাশ তার চেয়ে বড়, কিন্তু ভগবান বিষ্ণু একপদে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন। সাধুর হৃদয়মধ্যে সেই বিষ্ণুপদ। তাই সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।

॥ আপনার পূজা আপনি করিলে, এ কেমন লীলা তব ! ॥

না, ঠাকুরের কোনো অসুখ হয়নি। দেহ বোধ থাকলে তবেই সুখ, অসুখ। ঠাকুরকে প্রথমে চিনেছিলেন মথুরবাবু। ঠাকুর কৃপা করে তাঁকে চিনিয়েছিলেন, জমিদার মথুরানাথ, আমাকে চিনে নাও, কে আমি ! কার সেবা করছ তুমি, করবে তুমি ! হাটে হাঁড়ি ভাঙার আগেই ভেঙে দেওয়া।

মথুরানাথ দেখলেন, রাম আর কৃষ্ণ মিলে রামকৃষ্ণ তো বটেই, আবার শিব এবং কালী, শিবকালী। কোন্ দুশ্চর, দুরূহ সাধনে মথুরানাথের শ্রীরামকৃষ্ণে ইষ্টদর্শন হল ? সমর্পণে, বিশ্বাসে, সেবায়। মথুরানাথ ভোগী, রাজসিক। যৌবনের সেইকালে নানা এদিক সেদিক ত ছিলই। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণরূপী শ্রীকৃষ্ণ সখা পার্থকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রাখলেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ।' 'সর্বধর্মাণ পরিত্যজ্য' এবারে আর বলতে হল না কারণ এবারের লীলায় সব ধর্মই এক। ধর্মের সংজ্ঞাও অতি সহজ। সেবারের ধর্ম ছিল ক্ষত্রীয়ের রাজধর্ম। মহাপ্রভুরূপে প্রেমধর্ম। শঙ্কররূপে জ্ঞান-ধর্ম। গৌতমরূপে ত্যাগধর্ম, আর রামকৃষ্ণরূপে গৃহীর রসে-বশে ধর্ম। কিন্তু মূল নির্দেশটি এক—শরণং ব্রজ। আমার আশ্রিত হও। আর তখন আমি তোমার জন্যে কি করব! আমি তোমার জন্যে তোমারই রচনা পাঁকে নেমে পদ্ম ফোটাব। তোমাকে পরিশ্রুত করে আমার কৃপালাভের উপযুক্ত করব। আমি কেমন গোয়ালা ? না, তোমার পাত্র পরিষ্কার করে কৃপাদুগ্ধ ঢালব। 'অহং ত্বাং সর্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'। তোমার অনুশোচনার কিছু নেই। তুমি শুধু বুড়ি ছুঁয়ে থাক। আর অতি সামান্য একটি স্নেহের অনুরোধ—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।'

গিরিশচন্দ্রকে কৃপা করলেন, কিছুই যখন পারবে না তখন দাও, আমাকে বকলমা দাও। বললেন, গিরিশ ঘোষ, তোমাকে আমি এমন করে দোবো লোকে অবাক হবে। গিরিশচন্দ্রের দর্শন হল। একটু ঘুরিয়ে বললেন, 'ব্যাস, বাল্মীকী যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি আমি

কি করব! গিরিশচন্দ্র বারে বারে বলতেন, 'ঠাকুরের মিরাক্‌ল যদি দেখতে চাও, তাহলে আমাকে আর লাটুকে (অদ্ভুতানন্দ) দেখো।'

আর দেহাবসানের পর শ্রীশ্রীমা একটি মাত্র ক্ষেদোক্তিতে সব ব্যক্ত করে দিলেন, 'মা কালী গো! তুমি চলে গেলে!' কি অদ্ভুত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের এই অবতার লীলা। স্বামীজি বললেন, এমনটি আর কখনো হবে না। মহাকালের কোলে, এমনটি এই একবারই হল। ঠাকুর মাকে বলছেন, তুমিই ত মন্দিরে যিনি রয়েছেন তাঁরই প্রতিরূপ —মা ভবতারিণী। শ্রীশ্রীমা বলছেন, তুমিই আমার কালী। ভৈরবী বললেন, নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। গিরিশচন্দ্র বললেন, আপনি রাম, আপনি কৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরে কে এসেছিলেন গত শতাব্দীতে! কে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ! তুমি দেহ! তুমি জ্ঞান! তুমি চৈতন্য! তুমি প্রেম! তুমি গ্রামের! তুমি শহরের! তুমি সভ্যতার! তুমি সাধারণের! তুমি অসাধারণের, পাপীর, পুণ্যবানের, গৃহীর, সংসারীর। কে তুমি!

সেদিন যাঁরা কাছে ছিলেন তাঁর শ্রীমুখ থেকে শুনেছিলেন উত্তর, হয় তো বোঝেননি, কারণ, যা কালে আছে, 'কাল' না এলে উদ্ঘাটিত হবে না। মাস্টারমশাই (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সেদিন ঠাকুরের কাছে এসেছেন। সঙ্গে আছেন বন্ধু কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। মাস্টারমশাই বন্ধুকে বলেছেন, 'শুঁড়ির দোকানে যাবে তো আমার সঙ্গে এস ; সেখানে এক জালা মদ আছে।' মাস্টারমশাই ঠাকুরকে সেই কথা বলায়, তিনি হাসছেন, 'ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, এই আনন্দই সুরা ; প্রেমের সুরা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম। ঈশ্বরকে ভালবাসা'। তাহলেই জানা যাবে তাঁর স্বরূপ। জানা যাবে তাঁর তত্ত্ব, পাওয়া যাবে পথনির্দেশ। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে দুবার প্রিয় বললেন, তুমি আমার প্রিয় তাই তোমাকে আমি সর্বগোপ্য হতেও অত্যন্ত গোপনীয়, সর্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ শৃণু, ভূয়ঃ পুনর্বার শোনো। তোমার প্রকৃত কল্যাণকর সার কথা, 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে। ঠাকুর যেমন দিব্য করে বলতেন, 'মাইরি বলছি' শ্রীকৃষ্ণও সেইরকম অর্জুনকে বলছেন, 'প্রতিজানে'—প্রতিজ্ঞা করে বলছি, যা

বলছি তার মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই, 'তুমি আমাতে হৃদয় অর্পণ করো, আমার ভক্ত হও, আমার পূজনশীল হও, আমাকেই নমস্কার করো, তাহলে তুমি আমাকেই পাবে, কেন না তুমি আমার প্রিয়।

ঈশ্বরকে ভালবাসো তাঁর প্রিয় হও। 'জ্ঞান বিচার করে ঈশ্বরকে জানা বড় কঠিন।' ঠাকুর তখন সেই গানটি গাইলেন, তাঁর অতি প্রিয় গীত, যার কথায় তাঁরই তত্ত্ব বিধৃত,

কে জানে কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দরশন।
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন,
সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন

কৃপাময় শ্রীরামকৃষ্ণ। যাকে যে ভাবে দেখা দিলেন। কারো চোখে, অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্রাহ্মণ। কারো দৃষ্টিতে উন্মাদ। কেউ এখনো বিচার শেষ করে উঠতে পারেননি। কারো পাঁচসিকে পাঁচ-আনা বিশ্বাসে তিনি অবতার। স্বামীজির দৃঢ় জ্বলন্ত বিশ্বাসে, 'নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী।' স্বামীজির এই বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় যে, তিনি দুবার শপথ করে বলছেন—'নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ।'

দেহধারী ভগবানের বিচিত্রলীলার শেষখণ্ডটিতে আগত আধুনিক যুগের ইঙ্গিত। বুদ্ধদেব পরিণত বয়সে খাদ্যবিষে লীলা সমাপ্ত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিহত হলেন। মহাপ্রভু সমুদ্রে কৃষ্ণলীন হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেছে নিলেন, খ্রীস্টের 'সাফারিং'। ক্রুশের মতোই কণ্ঠে ধারণ করলেন ক্যানসার। ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলীকে সমস্ত উদাহরণই দেখিয়েছিলেন বাকি ছিল একটি, 'রোগ জানুক আর দেহ জানুক'। আত্মারামের আত্মাতেই আরাম, বিরাম, অভিরাম। দেহেরই সব। আত্মার লিঙ্গ নেই, ব্যাধি নেই। স্বামীজি গুরুর শরীরে দেখলেন, চল্লিশ বছর যাবৎ কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা, কঠোরতম সাধন, অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বিভূতি। তাঁর আবির্ভাবের কারণ খুঁজে পেলেন, 'পাশ্চাত্য বাক্‌ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধার'। মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বামীজীকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকি। মনে হয় তাঁর পায়ের চটি জুতো হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি। একমাত্র স্বামীজিই হাসতে হাসতে ঠাকুরকে বলতে পারেন, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে

মিছে।' একথা আমরা পাশ থেকে বলছি, স্বামীজি যা বললেন, তা একমাত্র স্বামীজিই বলতে পারেন—আমি সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী নই, 'আমি রামকৃষ্ণের দাস তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম ও সাধন-ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অনুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজি।' For 'we have taken up the cross. Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death.'

হিসেব করে দেখলেন, 'সময় হয়েছে নিকট এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' এতদিন বলেছেন, 'আমি খাইদাই আর থাকি, আর সব আমার মা জানেন।' কে মা! তিনি পুরুষ না প্রকৃতি! শ্যামা অথবা কৃষ্ণা! ছোট ছোট মানুষের সংকীর্ণ ধারণা। প্রকৃত কি?

কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন,
যেমন শিব বুঝেছেন কালীর মর্ম, অন্য কে বা জানে তেমন।

সেদিন অমাবস্যা, ৬ নভেম্বর, ১৮৮৫, ঠাকুর শ্যামপুকুর বাটীতে। কণ্ঠ ক্ষতের চিকিৎসা হচ্ছে। কদিন ধরে বারে বারে যীশুর প্রসঙ্গ হচ্ছে। ছদিন আগে শনিবার শ্যামপুকুর বাটীতে প্রভুদয়াল মিশ্র এসেছিলেন। উত্তর পশ্চিম ভারতের মানুষ। ব্রাহ্মণ। খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খ্রীষ্টান হয়েছেন। এক ভাইয়ের বিয়ের দিন সেই ভাই, আর এক ভাইয়ের এক সঙ্গে আকস্মিক মৃত্যুতে প্রভুদয়ালের মনে বৈরাগ্য এসেছে। তাঁর বাইরে সাহেবী পোশাক, ভেতরে গেরুয়া! কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু এক। ঠাকুরকে আগে দেখেছেন। অসুস্থতার সংবাদে প্রাণের টানে ছুটে এসেছিলেন শ্যামপুকুরে। সেই জোড়া মৃত্যুর দিন থেকেই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী। ইওরোপিয়ান পোশাকের তলায় গেরুয়া কৌপীন।

ঠাকুরের জীব-শরীর ক্রমশই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। এক একদিন এক এক রকম দেহলক্ষণ। পার্ষদদের মধ্যে ব্যাসদেবের মতো কেউ থাকলে উদ্ধবকে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে যেমন প্রশ্ন করিয়েছিলেন, অনুরূপ প্রশ্ন করাতেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়টি যেন যুগ-সন্ধ্যার সূচনাকারী এক বিমর্ষ

অধ্যায়। ভাগবতের 'শ্যামপুকুর বাটী'। সাহসী উদ্ধবের অনুপস্থিতিতে কেউ প্রশ্ন করতে পারছেন না—

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সংত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ ন যদীশ্বরঃ॥

সখা উদ্ধব পরপর চারটি বিশেষণ প্রয়োগ করলেন, দেবদেবেশ, যোগেশ, পুণ্যশ্রবণকীর্তন। দেবদেবেশ দুটি বিশেষণের যোগ। দেব দেব-ঈশ। দেবতা শ্রেষ্ঠেরও নিয়ন্তা। হে দেবদেবেশ, যোগেশ, পুণ্যশ্রবণকীর্তন। সর্বশক্তিমান সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও তুমি যে বিপ্রশাপ নিবারণ করলে না, তাতে মনে হয়, তুমি নিশ্চয় এই বংশ নাশ করে ইহলোক ত্যাগ করবে!

শ্রীভগবান অপূর্ব হেসে বললেন, সখা উদ্ধব, তোমার অনুমান অভ্রান্ত। ব্রহ্মা, শংকর এবং অন্য লোকপালগণের ইচ্ছা যে, আমি নরলীলা শেষ করে বৈকুণ্ঠধামে ফিরে যাই। শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় প্রশ্ন নেই অনুমান আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যে-কাজ করার জন্যে অংশাবতার বলরামের সঙ্গে আমি এসেছিলুম সে-কাজ পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম নরেন্দ্রনাথ বলছেন, সে-কাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ যা করতে এসেছিলেন তা সারা হয়নি। ১৮৯০, ২৬ মে, স্বামীজী বাগবাজার থেকে প্রমদাবাবুকে লিখছেন—'সেই মহাপুরুষ যদ্যপি ৪০ বৎসর যাবৎ এই কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং পবিত্রতা এবং কঠোরতম সাধন করিয়া ও অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বিভূতি-মান হইয়াও অকৃতকার্য হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কি ভরসা?'

এ যেন অর্জুনের বিষাদযোগ! সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির মতো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের 'পাওয়ার' এগিয়ে এসে নরেন্দ্ররথের লাগাম ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সংহার, সৃজন ও পালনের ত্রিশূল শিবকালী শক্তি। বুকে হাত রেখে নরেন্দ্রনাথকে তখন বিদ্যুৎ-কণ্ঠে বলতে হবে—পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা। / চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'

উদ্ধব কটি বিশেষণ লাগিয়েছিলেন! নরেন্দ্রনাথ উজাড় করে দিয়ে শান্ত হলেন অবশেষে প্রণাম মন্ত্রে ঃ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে। / অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

শ্যামপুকুর বাটীতে পটভূমি প্রস্তুত। সাগর সন্নিকটে নদী শান্ত, ধীর, গভীর। ভাব অনেক ঘন, কথা অনেক বেশী অর্থবহ। কণ্ঠ কথাপ্রকাশে বিদ্রোহী। সর্বকালের সর্বদর্শনের সমন্বয় ঘটছে। যে-সব প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যেত না, সেই সব প্রশ্নের উদার সমাধান হচ্ছে। বিচলিত ধর্ম পাকাপোক্ত ভাবে সমস্ত রকমের বিশ্বাসে স্থাপিত হচ্ছে।

প্রভুদয়াল বললেন, 'ওহি রাম ঘট্ ঘটমে লেটা।'

ঠাকুর ছোট নরেনকে মৃদুকণ্ঠে বলছেন, ইচ্ছে যে প্রভুদয়ালও যেন শুনতে পান, 'এক রাম তাঁর হাজার নাম'। একটু বিরতির পর বললেন, 'খ্রীষ্টানরা যাঁকে God বলে, হিন্দরা তাঁকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর—এই সব বলে। পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বলছে জল ; ঈশ্বর। খ্রীস্টানেরা আর-এক ঘাটে খাচ্ছে—বলছে, ওয়াটার ; গড্ যীশু। মুসলমানেরা আর-এক ঘাটে খাচ্ছে—বলছে, পানি ; আল্লা।'

ভাবস্থ ঠাকুর। কথা কটি বলে থামলেন।

প্রভুদয়াল বললেন, 'মেরির ছেলে Jesus নয়। Jesus স্বয়ং ঈশ্বর।

এরপর প্রভুদয়াল ভক্তদের তাঁর অদ্ভুত উপলব্ধি ও দর্শনের কথা বললেন, 'ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন এই আছেন—আবার এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আপনারা এঁকে চিনতে পাচ্ছেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম, একটি বাগান, উনি উপরে আসনে বসে আছেন ; মেঝের ওপর আর একজন বসে আছেন,—তিনি ততটা advanced নন।' এইবার যে-কথাটি বললেন সেটি ভারি সুন্দর—'এই দেশে চারজন দ্বারবান্ আছেন। বোম্বাই অঞ্চলে তুকারাম, কাশ্মীরে রবার্ট মাইকেল, এখানে ইনি, আর পূর্বদেশে আর একজন।'

ঠাকুর শৌচে গেলেন। প্রভুদয়াল পোশাকাদি খুলে গেরুয়া কৌপীনখানি পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। শৌচ থেকে ফেরার

পথে ঠাকুর দেখলেন। ঘরে এসেছেন ঠাকুর। প্রভুদয়াল পোশাক পরিধান করে এসেছেন। ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন পশ্চিমাস্য। প্রভুদয়ালকে এই কথাটি বলতে বলতেই সমাধিস্থ—'তোমাকে দেখলাম বীরের ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে আছ।'

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রভুদয়ালকে দেখছেন, হাসছেন, ভাবস্থ অবস্থায় শেক হ্যান্ড করছেন, আবার হাসছেন, ভক্ত প্রভুদয়ালের হাত দুটি ধরে কৃপা করছেন, 'তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে।' উপস্থিত মহেন্দ্রনাথ ভাবছেন, ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হল। নিজেকেই প্রশ্ন করছেন, 'ঠাকুর আর যীশু কি এক?'

শ্যামপুকুর বাটীতে Jesus Christ.

সেই শনিবার আজ শুক্রবার। অমাবস্যা। ৺কালীপুজো আজ।

মাস্টারমশাই সকালে স্নান সেরে, নগ্নপদে ঠনঠনের ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দিরে। গুরুর আদেশ। 'পুষ্প, ডাব, চিনি, সন্দেশ দিয়ে সকালেই পুজো দেবে।' আর একটি আদেশ, ডাক্তার সরকারের জন্যে কিনে আনবে, রামপ্রসাদের, কমলাকান্তের গানের বই।

মাস্টারমশাই আদেশ পালন করে শ্যামপুকুর বাটীতে প্রবেশ করছেন। সকাল ৯টা। দোতলার দক্ষিণের ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন ঠাকুর। পরিধানে শুদ্ধবস্ত্র, কপালে চন্দনের ফোঁটা। মা বোধহয় সাজিয়ে দিয়েছেন!

মাস্টারমশাই ঘরে প্রবেশ করে বললেন, 'এই যে প্রসাদ, আর এই গানের বই।'

ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে পাদুকা খুলে, অতি ভক্তিভরে প্রসাদের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করলেন, কিঞ্চিৎ ধারণ করলেন মস্তকে। মাস্টারমশাইকে বললেন, 'বেশ প্রসাদ।'

বেলা বাড়ল। ক্রমশই বাড়ল ভক্ত সমাগম। বেলা তখন দশটা।

ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বললেন, 'আজ কালীপুজো, কিছু পুজোর আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার বলে এস। পাঁকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞেস করো দেখি।'

রাত সাতটা। অমাবস্যা-রাতের পিচকালো আকাশ শহরের ওপর উপুড় হয়ে আছে। বাড়িতে বাড়িতে দীপমালা। মা দুর্গা এসেছিলেন শরতের মেঘমালা নিয়ে। তাদেরই কয়েকখণ্ড শেষ যাত্রী

হয়ে ভেসে চলেছে হিমালয়ের দিকে।

ওপরের সেই দক্ষিণের ঘরেই পূজার সমস্ত আয়োজন হয়েছে।

ঠাকুর বসে আছেন। তাঁরই সামনে সাজান হয়েছে নানা রকমের ফুল, বেলপাতা, জবা, চন্দন, পায়স, নানাবিধ মিষ্টান্ন। ভক্তেরা বসে আছেন ঘিরে। 'শরৎ, শশী, রাম, গিরিশ, চুনিলাল, মাস্টার, রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী, আরো অনেকে।'

রাত ক্রমশ ময়রার দোকানের ভিয়েনের মতো জমছে। আকাশের এধারে ওধারে মাঝে মাঝেই ফুঁসে উঠছে তারা বাজি। ঘরে জ্বলছে দেয়ালগিরি, বড় বড় প্রদীপ। দেয়ালে ছায়া কাঁপছে।

ঠাকুরের আদেশ শোনা গেল, ধুনা আন।'

ধুনোর ধোঁয়ায় ঘরের পরিবেশ আরো রহস্যময় হল। দক্ষিণেশ্বরের পরে, পঞ্চবটীতে তন্ত্র সাধনার বহুদিন পরে ঠাকুর আবার পূজারী। প্রতিমা অন্তরে। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর জগন্মাতাকে সব নিবেদন করে দিলেন। মাস্টারমশাই একেবারে পাশটিতে বসেছিলেন। ঠাকুর বললেন, 'একটু সবাই ধ্যান করো।'

ধুনো, চন্দন, গুগ্‌গুলের ধোঁয়া মহাদেবের জটাজালের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। ফুল, বেলপাতার সুবাসের সঙ্গে মিশে অপূর্ব সৌরভ। ধ্যানস্থ ভক্তমণ্ডলী, ধ্যানস্থির প্রদীপশিখা। আসনে নিশ্চল জ্যোতির্ময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে হচ্ছে, সোনার প্রতিমা।

হঠাৎ গিরিশচন্দ্রের হাত দুটি কোল ছেড়ে উঠছে। হাতে ধরা আছে একটি জবার মালা। এগিয়ে যাচ্ছে ঠাকুরের পাদপদ্মের দিকে। গিরিশের অঞ্জলি। মাস্টারমশাইও অঞ্জলি দিলেন পুষ্প ঠাকুরের শ্রীচরণে। আর কি ঠেকান যায়! পরপর ভক্তদের অঞ্জলি, 'রাখাল, রাম…।' 'নিরঞ্জন' শ্রীপদে ফুল দিয়ে ভাবাবেগে ঘরের নিথর নীরবতা চমকে দিলেন, 'ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মময়ী' বলতে বলতে ভূমিষ্ঠ হয়ে চরণে মাথা রাখলেন। আরতির মতো ভক্তকণ্ঠে সমবেত রব—'জয় মা! জয় মা!'

দেখতে দেখতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। সবাই আশ্চর্য হতবাক। ঠাকুর ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছেন, মুখমণ্ডলে অলৌকিক দিব্যদ্যুতি, উত্থিত দুই হস্তে বরাভয়, নিস্পন্দ, বাহ্যশূন্য। বসে আছেন উত্তরাস্য। দক্ষিণেশ্বরের মা, চতুর্ভুজা

জগন্মাতা শ্যামপুকুর বাটীতে আজ 'দ্বিভুজা বরাভয়া'।

গিরিশচন্দ্র শুরু করলেন স্তব ঃ

কে রে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুরসমাজে।
কে রে রক্তোৎপল চরণ যুগল হর উরসে বিরাজে॥

ঘুরে গেল শতাব্দী। আর একটি শতাব্দীরও অস্তকাল। চরিত্র সব ইতিহাস। ঘটনা, স্মৃতি। শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুরের সেই সত্তর দিনের অধিষ্ঠান আজ এক মহাপীঠস্থান। সেদিন ছিল চাঁদের আলোর রাত। শ্যামপুকুর বাটীর দোতলার সেই ঘরে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজির পাঠ ছিল। উপচে পড়া ভক্তসমাগম। প্রসঙ্গ সমাপ্ত। ভক্তমণ্ডলী বিদায় নিলেন। একেবারে নিরালা উঠোনে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছি। শেষ ঝাড়টি তখনো নেবেনি। পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীম-র বংশধর, নীরব কর্মী গৌতম গুপ্ত।

ওই সেই বারান্দা, ওইখানেই দাঁড়িয়েছিলেন ঠাকুর, পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র, কপালে চন্দনের টিপ। শ্রীম আসছেন, হাতে ঠনঠনের ৺সিদ্ধেশ্বরী মাতার প্রসাদ। আজও তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বলেছিলেন প্রেমের চোখে দেখা যায় তাঁকে। চোখে প্রেম! সে তো অনেক পরে, আগে বিশ্বাস। মনের বিশ্বাস!

॥ কে তুমি বিবেকানন্দ ॥

দক্ষিণেশ্বরে দেবালয়ের পাশেই যদু মল্লিকের বাগানবাড়ি। ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন, পাশেই তাঁর অন্যতম ভক্ত শরৎচন্দ্র (পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দ)। ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বাগানের ম্যানেজার রতনবাবু। ঠাকুর রতনকে বলছেন, 'জানো তো, এরা সব ছেলে মন্দ নয়—দেড়টা পাশ করেছে—শিষ্ট, শান্ত; কিন্তু নরেন্দ্রের মতো একটি ছেলেও আর দেখতে পেলুম না। যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না। আমার নরেন্দ্রের ভেতর এতটুকু মেকি নেই; বাজিয়ে দেখ টংটং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ কান টিপে কোন রকমে দু-তিনটে পাস করেছে—বাস্ এই পর্যন্ত! এ করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, হেসে-খেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কিছুই নয়! সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়; কিন্তু অন্য ব্রাহ্মদের মতো নয়—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি!'

ফুলে, ফুলে ভরে আছে বাগান। ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন সেই বাগানে। সবুজ ঘাসের ওপর। মৃদুমন্দ বইছে গঙ্গার বাতাস। চারপাশ বড় উৎফুল্ল। ঠাকুর যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সামনেই যদুবাবুর বৈঠকখানা। বড়লোকের বসার ঘর যেমন হয়, সুসজ্জিত, সুরম্য অতি। কোণে কোণে নানা আকারের শ্বেতপাথরের টেবিল। সোফা-সেট। দেয়ালে আরো কয়েকটি ছবির সঙ্গে সেই বিখ্যাত ছবিটাও ঝুলছে—ম্যাডোনার কোলে শিশু যীশু। এই ছবিটি প্রথম দর্শনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। পাশেই আর এক মল্লিক, শম্ভু মল্লিকের বাগান বাড়ি। আলাপী মানুষ। ঠাকুর মাঝে মধ্যে শম্ভুবাবুর বাগানে গিয়ে বাইবেল শুনতেন। শুনতে শুনতে এমনই মোহিত হলেন, শুরু করলেন খ্রীষ্টধর্মসাধন। একদিন এই বৈঠকখানায় ওই ছবিখানির দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বসে আছেন

ভাবস্থ। শম্ভুবাবু বাইবেল থেকে ঈশার জীবনকথা তাঁকে শুনিয়েছেন। ঠাকুর ছবিখানির দিকে অনিমেষে তাকিয়ে আছেন আর সেই অদ্ভুত জীবনকথা ভাবছেন। হঠাৎ! হঠাৎ ছবিটি জীবন্ত, জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। দেবজননী ও দেবশিশু দু'জনেই প্রাণবন্ত। দুজনের দেহ হতে বিচ্ছুরিত জ্যোতিরশ্মি ঠাকুরের দেহে প্রবেশ করছে। তিনি অনুভব করতে পারছেন, চিন্তার জগতে ভীষণ এক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। হিন্দু-ভাব, হিন্দু-সংস্কার বদলে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কাতর-কণ্ঠে বলছেন, 'মা, আমাকে এ কি করছিস!' মা শুনলেন না সে প্রার্থনা। পুরো তিনটে দিন ঠাকুর হয়ে রইলেন খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টানের সংস্কার, খ্রীষ্টানের ভাব। হিন্দু দেব-দেবীর ওপর কোনো বিশ্বাস নেই। মানসভাবে গির্জাবাসী। অল্টারে সার সার মোমবাতি, প্রার্থনার গভীর, গম্ভীর সুর, পাদপীঠে নতজানু মানুষ, চার্চবেল। অবশেষে পঞ্চবটীতলে যীশুর দর্শন। দেখছেন অদৃষ্টপূর্ব এক দেবমানব, সুন্দর, গৌরবর্ণ, স্থির-দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছেন। দর্শনমাত্রেই ঠাকুর বুঝছেন, ইনি বিদেশী। কে ইনি? সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতর থেকে কে বলে উঠলেন, 'চিনলে না! ঈশামসি—দুঃখ-যাতনা থেকে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্যে হৃদয়ের রক্ত ঝরিয়েছিলেন, সেই মানুষেরই নির্যাতনে ক্রুশ বিদ্ধ। সেই পরমযোগী, সেই পরমপ্রেমী তোমার সামনে।' যীশু ঠাকুরকে আলিঙ্গন করে তাঁর শরীরে লীন হয়ে গেলেন। ঠাকুর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

এই সেই যদু মল্লিকের বাগানবাড়ি। প্রথম দর্শনে নরেন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল, 'এ কাকে দেখতে এসেছি! এতো একেবারে উন্মাদ, তা না হলে, আমি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, আমার হাত দুটো ধরে কাঁদতে কাঁদতে কেউ বলেন, যেন কতদিনের পূর্বপরিচিত আমি, 'এতদিন পরে আসতে হয়! আমি তোমার জন্যে কত প্রতীক্ষা করে বসে আছি, সে-কথা একবার ভাবলে না! বিষয়ী লোকের যত বাজে কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে যাবার উপক্রম। প্রাণের কথা কারোকে বলতে না পেরে আমার পেট ফুলে উঠেছে।' কাঁদছেন আর বলছেন। এইতেই শেষ নয়। আমি যেন দেবতা। সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই প্রাচীন ঋষি, নররূপী

নারায়ণ ; জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে আবার শরীর ধারণ করেছ ।'

বায়ু ! বায়ুর প্রভাব। আটর্নির ছেলে নরনারায়ণ ! লোকে শুনলে হাসবে। তবে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, দিব্য প্রভাব। অদ্ভুত, অপ্রাকৃত উল্লাসে মন ভরে গিয়েছিল। জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল, মধুমাখা কণ্ঠস্বর, প্রেম-টলটলে দুটি চোখ। থেকে থেকে সমাধি। ঘরভর্তি বিমুগ্ধ মানুষ। সকলেই বিদ্বান, বুদ্ধিমান ! তাহলে। সিদ্ধান্তটা কি সমুচিত হল। কোথায় একটা কী আছে। দিব্য আকর্ষণ। কেষ্ট, বিষ্ণু অলৌকিক—এ সব তো আমি কিছুই মানি না। এমন কি ব্রহ্মও মানি না। ব্রাহ্মসমাজে যাই বটে, দুটো কারণে, কেউ কী ঈশ্বরকে জেনেছেন, পেয়েছেন তাঁর ঠিকানা। আমি যুক্তিবাদী। ভাল, মন্দ কোনো সংস্কারই আমার নেই। আমি কংক্রিট প্রমাণ চাই। No abstraction। দ্বিতীয় কারণ, সংগীত। ওস্তাদের গান শিখেছি, গাই গাইব।

তবু পারলেন না। মাসখানেক পরে মনে হল, কথা যখন দিয়েছি আর একবার যাই। উন্মাদ হয়তো, কিন্তু বড় সৎ, বড় প্রেমিক। সৎসঙ্গে দোষ কী। সর্বোপরি কৌতূহল। কে ইনি। কেন ওই সব বললেন ! আমি তো জানি, আমি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে। সিমুলিয়ায় থাকি। কলেজে পড়ি। বেণী ওস্তাদের কাছে গান শিখি। অম্বু গুহের আখড়ায় কুস্তি করি। তাহলে, ওসব কি বললেন !

দক্ষিণেশ্বর এত দূর জানা তো ছিল না। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, পথ আর ফুরোয় না। অবশেষে সোজা ঠাকুরের ঘরে। কোথাও আর থামাথামি নেই। নিজের ছোট্ট খাটটিতে বসে আছেন, একেবারে একা। শান্ত, সৌম্য, সহজ, সরল আত্মভোলা একজন মানুষ। দেখা মাত্র মুখ উদ্ভাসিত। 'এসো, এসো বসো এখানে।' খাটের আর এক প্রান্তে নরেন্দ্রনাথ বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর অন্য একটা ভাবে চলে গেলেন। মুখে আহ্লাদের আর কোনো প্রকাশ নেই। বিড় বিড় করে কি সব বলছেন। নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে আছেন স্থির দৃষ্টিতে। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন নরেন্দ্রনাথের দিকে। 'এই রে ! পাগল বুঝি আগের দিনের মতো আবার কোনো

পাগলামি করবে।'

ভাবতে না ভাবতেই ঠাকুর তাঁর দক্ষিণ পা দিয়ে নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করলেন। মুহূর্তে প্রলয়। 'দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে।' দারুণ আতঙ্কে নরেন্দ্রনাথ চিৎকার করে উঠলেন—আমিত্বের নাশই তো মরণ, সেই মরণ সামনে, সন্নিকটে, 'ওগো, তুমি আমার একি করলে? আমার যে বাপ-মা আছেন।'

খল খল করে হাসছেন অদ্ভুত সেই পাগল! সামনের দাঁত দুটির মাঝে সামান্য ফাঁক। মুখে অলৌকিক প্রভা। অদৃশ্য কোনো আলো এসে পড়েছে। নরেন্দ্রনাথের বুকে হাত রেখে বললেন, 'তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নেই, কালে হবে!' সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ অসীম থেকে সসীমে ফিরে এলেন। 'কালে হবে!' নরেন্দ্রনাথ তখনো জানেন না, কি হবে!

এই সেই যদু মল্লিকের বাগানবাড়ি। সাতদিন পরেই ঠাকুরকে নরেন্দ্রনাথের তৃতীয় দর্শন। ঠাকুর বললেন, 'চলো, পাশের বাগানে বেড়িয়ে আসি।' বাগানবাড়ির গঙ্গার ধারে দুজনে সমবয়স্ক বন্ধুর মতো অনেকক্ষণ বেড়ালেন। বাতাসের বিকেল। দুজনের চুল বাতাসে এলোমেলো। বসনপ্রান্ত উড়ছে। যদুবাবুর নির্দেশ ছিল, ঠাকুর আসামাত্রই গঙ্গার ধারের বৈঠকখানা ঘরটি যেন খুলে দেওয়া হয়। রতন নির্দেশ পালন করেছেন। কিছুক্ষণ বেড়াবার পর ঠাকুর বললেন, 'চলো বসি।' যদু মল্লিকের বৈঠকখানা। ঠাকুর ঘরে এসেই সমাধিস্থ। নরেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে দেখছেন। তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেব বলেছিলেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমাধি হত। সমাধির পরিচয় যদি পেতে চাও, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখে এসো। সেখানে একজন আছেন যাঁর সমাধি হয়। এই সেই সমাধি।

ঠাকুর হঠাৎ নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত। কেউ কোথাও নেই। বাগানময় ফুলের শোভা। সামনে প্রবাহিত গঙ্গা। সন্ধ্যা নামবে। ঠাকুর নরেন্দ্রের কানে

কানে প্রশ্ন করছেন, 'তুমি কে ?' নরেন্দ্রনাথ অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে উত্তর খুঁজে আনলেন। 'তুমি কোথা থেকে এসেছ ?' 'কেন এসেছ ?' 'কতদিন থাকবে এখানে ?' সব মিলে গেল। একদিন সমাধি পথে যা যা দেখেছিলেন। 'আমি সপ্তর্ষির এক ঋষি। এসেছি অখণ্ডের ঘর থেকে। কেন এসেছি ? তুমিই তো ডেকে এনেছ, তোমার কাজে, প্রেমের প্রচারে। আমাকে দিয়ে তুমিই বলাবে, 'আজই হোক, কালই হোক, শতশত যুগ পরেই হোক, সত্যের জয় হবেই, প্রেমের জয় হবেই। ঈশ্বরের খোঁজ কোথায় করছ ? বহুরূপে সম্মুখে তোমার। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ঈশ্বর ! Love, that wonderful four lettered word.'

'নরেন্দ্র যেদিন জানতে পারবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ় সংকল্প সহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর ত্যাগ করবে। নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।'

॥ ২ ॥

বহুদিন ধরে বহুকিছু দেখা ও শোনার পর মানুষ আজ যদি এইরকম একটি জগৎ বিভাজন তৈরি করেন, ধর্মের জগৎ আর অধর্মের জগৎ তাহলে সকলেই মনে হয় অখুশি হবেন। যদি এমন একটা নির্দেশ জারি করা হয়, প্রবণতা, নির্দেশ ও মগজধোলাই অনুসারে নিজেদের জগৎ নির্বাচণ করে জমায়েত হও। তাহলে কি দুপ্রান্তরে পৃথিবীর মানুষের বিভাজন হয়ে যাবে—ধর্মক্ষেত্রে একদল আর অধর্মক্ষেত্রে আর একদল। ধর্ম কোনো প্রান্তরে আবদ্ধ নয়। ধর্ম অসীম আর অনন্তের উপলব্ধি। ক্ষুদ্রতার, সংকীর্ণতার উদারতায় মুক্তি। মন্দির নয় মসজিদ নয়, মনই স্রষ্টা আপাতত যাঁর নাম ঈশ্বর, তাঁর শ্রীনিকেতন।

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার'—কোথায় ছুটছ তাঁর সন্ধানে ! সমগ্র বিশ্ব যার মধ্যে ডুবে রয়েছে তাঁরই নাম ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশখণ্ডে সেই শাণ্ডিল্য-বিদ্যাই বিবৃত, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীত'—বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে, এই যে যা কিছু দেখছ—সব, সব কিছুই ব্রহ্ম। এটা তো তত্ত্ব ! বইয়ে লেখা হয়ে আছে হাজার বছর।

তাতে মানুষের কি হল !

হল না এই কারণে, কেউ ভাল করে বুঝিয়ে দিলে না, প্রকৃত রহস্যটা কি ? 'হোই হোথায় ঈশ্বর !' আকাশের দিকে হাত তুলে দিলে। ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে বিশাল এক শক্তি, সর্বত্র সেই শক্তিরই প্রকাশ। অর্থাৎ সগুণ নিরাকার শক্তিই ঈশ্বর। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এটি আরো ফলাও হল। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান ঘুচল না। মাঝখান থেকে ধর্মযাজক পুরোহিতরা এসে শৌর্য, বীর্যের ধর্মের বদলে, শাস্ত্রের ঘাড়ে কুসংস্কারের শাস্ত্র চাপিয়ে ধর্মের অত্যাচারে খোদ ধর্মকেই অধর্ম করে তুললেন। ঈশ্বর প্রকৃতির বাইরে নেই, ভেতরেও নেই। ঈশ্বর, প্রকৃতি, আত্মা, জগৎ—এগুলো একপর্যায় শব্দ। স্বামীজি বলছেন, প্রকৃতপক্ষে দুটি বস্তু নেই, কতকগুলো দার্শনিক শব্দ মানুষকে প্রতারিত করছে।

বড়লোকের ছেলে, কলেজে ইংরিজি শিক্ষা নেওয়া ছেলে, ব্রাহ্ম-সমাজে আসা-যাওয়া করা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান, যুবরাজের মতো দেখতে সর্বগুণান্বিত এক যুবকের মহা কৌতূহল—ঈশ্বর কে ? আমি ঈশ্বরকে দেখব ! কে দেখাতে পারে ! কলকাতা শহরে এমন কে আছেন ? ইংরেজের কলকাতায় ইওরোপের হাওয়া, 'মেটাফিজিক্স' শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত মানুষের চর্চার বিষয়। কান্ট, হেগেল, হিউম, কোঁত, স্পিনোজা, হবস, ডেকার্ট। দর্শনের আকাশে চিন্তাবিদ্ জ্যোতিষ্ক। এই সম্পর্ক হয় তো একটা কারণ। আসল কারণ আরো গভীর, সেটি হল সংস্কার।

গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে—'ঈশ্বরকে দেখেছেন ?' মহর্ষি পাশ কাটিয়ে গেলেন, বললেন, 'তোমার চোখ দুটো ভারি সুন্দর, যোগীর চোখ'। বুঝলেন, সব হয়েছে ঈশ্বরদর্শন হয়নি ! ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল না হলেই বা কি হত ! অভাব তো কিছুই ছিল না। তাহলে একটাই হত, বিবেকানন্দ হত না। না হলেই বা কি হত ! হত, মানুষের কণ্ঠস্বরের মতো বিশ্বেরও কণ্ঠস্বর আছে, সেই স্বরের এক একটি পর্দা, ক্রাইস্ট, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, আরো অনেকে ! একটি ঐকতান, সেটি স্বামীজির বয়ানে এইরকম : 'হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার

হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক' নামক মত দ্বারা সর্বপ্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।'

'পারমার্থিক' আর 'ব্যবহারিক' শব্দ দুটির ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। মানুষকে বলা হল, তোমাদের শাস্ত্রে আছে, সকলের ভেতর সেই এক আত্মার অধিষ্ঠান, অতএব সকলের প্রতি সমদর্শী হও, কারোকে ঘৃণা করো না। এই হল তোমাদের ধর্মশাস্ত্রের মূল কথা। মানুষ শুনল ; কিন্তু কাজের বেলায় বিপরীত আচরণ। উত্তর হল, ও তো শাস্ত্রের পারমার্থিক ব্যাখ্যা—'সব সমান' কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক।

এই ব্যভিচারী ধর্ম ও ধর্মগুরুদের কাছ থেকে স্বামীজি তাঁর অনুসন্ধানকে পাবেন না, বুঝে গেলেন। পাশ্চাত্যের মনীষীদের চিন্তার ধারা ভুল পথে চালিত। সীমার দ্বারা অসীমকে স্পর্শ করা যায় না। অসীম অরূপকে জগতের জ্ঞান দিয়ে ধরা যায় না। সে চেষ্টা বৃথা। নরেন্দ্রনাথ সেই বয়সেই বুঝে গিয়েছিলেন, হিন্দুধর্ম কেন বিশ্বধর্মের সারতত্ত্ব ঋষিকুলের বেদে আছে। উপনিষদ সেই বেদেরই প্রধান ধারা। সিমুলিয়ার ধনী অ্যাটর্নির কৃতী পুত্র, সঙ্গীতজ্ঞ, অ্যাথলিট, তার্কিক, সুবক্তা, অলৌকিক মেধা ও স্মৃতির অধিকারী উপনিষদের তত্ত্বে মোহিত, অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদন্মহিমানমাত্মনঃ॥ যিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, আবার বিশাল হতে বিশালতর, এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থিত। ঘণ্টা নেড়ে, তিলক চর্চা করে, তর্ক করে তাঁকে দর্শন করা যায় না। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ না হলে, নিষ্কাম, না হলে দর্শন করা যায় না। দর্শনের ফলে জাগতিক বিত্ত মিলবে না। মানুষ অদ্ভুত একটা অবস্থা লাভ করে, সেই অবস্থার নাম বীতশোকঃ। দুঃখ সুখের পারে চলে যাওয়া।

দক্ষিণেশ্বরে পেলেন সেই ভগবৎপ্রেমী সাধককে। তিনি এসে-

ছিলেন এই প্রত্যয় নিয়ে, 'পৃথিবীতে কোন্ পাওয়াটা মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, যার পর আর কোনো চাওয়াই থাকে না।' আমি জানব। আমি জানব, জ্ঞানের শেষ দিগন্তে কে আছেন, কি আছে! পৃথিবীতে সবই অস্থায়ী, অনিত্য। স্থায়ী কি? কাকে বলতে পারি নিত্য। সবই ত অনিত্য!

শ্রীরামকৃষ্ণের পরীক্ষা, অনুসন্ধান তখন সমাপ্ত। তিনি অন্বেষিতকে পেয়েছেন, বুঝেছেন। জগৎ তাঁর সামনে। কয়েক কোটি মানুষের বেঁচে থাকার চিত্র তাঁর সামনে। তিনি তখন দৃঢ় বিশ্বাসে বলতে পারছেন—যত্র জীব তত্র শিব। তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পারছেন, যত মত তত পথ। তিনি বলতে পারছেন, ধর্ম মানে হওয়া।

কলেজী যুবক নরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রশ্ন নিয়ে এলেন। তাঁর প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস, জীবন বিশ্বাস, জ্ঞান বিশ্বাস, মেধায় বিশ্বাস, তর্কে বিশ্বাস চুরমার করে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন, কোন্ চোখে ঈশ্বরকে দেখা যায় জানিস, প্রেমের চোখে। জাগতিক জ্ঞান, বৈধীধর্ম, পাণ্ডিত্য, কোনো কিছু দিয়েই তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। তাঁর প্রবল বিশ্বাসে, তিনি উপনিষদের তত্ত্বই প্রকাশ করলেন, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, সবই ব্রহ্ম, ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম, একথা আমি বিশ্বাস করি না। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে তাঁকে সামান্য স্পর্শ করা মাত্রই, নরেন্দ্রনাথের 'আমি' Egoself বিশ্ব 'আমি'তে তলিয়ে গেল। ঘর, বাড়ি, দেয়াল, রাস্তা, দৃশ্য জগৎ ঘুরপাক খেতে খেতে অনন্তে অদৃশ্য। শুধু জ্যোতি আর জ্যোতি। অনন্তের নিঃসীম জ্যোতির্ময় শূন্যতায় ভীত নরেন্দ্রনাথ চিৎকার করে উঠলেন, 'এ কি করলে তুমি, আমার যে বাবা, মা আছেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অসীম থেকে সসীমে ফিরিয়ে আনলেন নরেন্দ্রনাথকে। বললেন, দরজা বন্ধ রইল চাবি আমার কাছে থাক। সময় হলে আবার খুলব। নিজেকে তৈরি করো। এসো বসি দুজনে। দেখে নিয়েছি ভগবানকে। এসো এইবার মানুষকে দেখি। মানুষই ভগবান। খাজা আহাম্মকের চোখে নয় বুদ্ধিমানের চোখে দেখি, মানুষের অবস্থা। মানুষ মানুষের দ্বারাই নিপীড়িত, শাসিত,

শোষিত, দাসে পরিণত। কি রকম জানিস, ভগবান ভগবানের দ্বারাই শৃঙ্খলিত। God, the devine, God the wicked, God the Sinner. সাধুরূপী নারায়ণ, তস্কর রূপী নারায়ণ, লোচ্চারূপী নারায়ণ, ঘাতক নারায়ণ, রক্ষাকারী নারায়ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে চাইলেন, System, Custom. Ageold Order, যা হয়ে আছে, সে যেন আলাদা এক যন্ত্র, যার কলে স্বয়ং ভগবানই ত্রাহি, ত্রাহি করছেন। ধর্ম যেমন আছে থাক। ওই জটিলতা থেকে বিশ্বাসটা তুলে নাও, ভগবৎ বিশ্বাস, তার চেয়ে শক্তিশালী বস্তু আর দ্বিতীয় নেই। সেই বলে বলীয়ান হয়ে নিজেকে বলি দাও। নিজেকে বজ্রবাঁটুল তৈরি করো।

ধ্যান করো। ধ্যানের মাধ্যমে দেখে নাও এই বিরাটে তোমার স্থান কোথায়। বিন্দু। সেই বিন্দুতে তুমি সিন্ধু দর্শন করো। ঠাকুরঘর, মূর্তি, মন্ত্র যেখানে আছে থাক। ভেতর থেকে বাইরে এসো। অন্তরে বিশ্বকে স্থান করে দাও। জ্বলে ওঠ আত্মার পরম জ্যোতিতে। খুলে দাও, হৃদয়ের দ্বার। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করে দিলেন, নরেন্দ্রনাথের জন্যে, 'যা উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাই পাপ বা অধর্ম ; আর যা উন্নত ও সমন্বয়-ভাবাপন্ন হবার সাহায্য করে, তাই ধর্ম।' গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, ধর্ম দলেও নেই, ধর্ম হুজুগেও নেই। নরেন্দ্রনাথ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেন, আমার গঠনকারীকে আমি খুঁজে পেয়েছি, 'রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নেই। সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার, যেমন তিনি নিজে বলতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ 'লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী বলা হইয়াছে, নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ, এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত 'মহাপুরুষ-প্রণিধানাত্বা।'

নরেন্দ্রনাথের জীবনগঠন চুরমার হয়ে গেল। পিতার মৃত্যু, জ্ঞাতীদের শত্রুতা, পিতার রেখে যাওয়া ঋণের বোঝা, ভিটে মাটি ছাড়া, নিদারুণ দারিদ্র্য, দিনের পর দিন অনাহার, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান। বাস্তব জগতের নখর-দন্ত যুক্ত সংহার-রূপ স্পষ্ট। এর

মাঝে ধর্ম কোথায় ! কোথায় ত্যাগ ! কোথায় প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী, গৌতমবুদ্ধের নির্বাণ, শঙ্করের জ্ঞান, শ্রীচৈতন্যের প্রেম ! মৃত্যুরূপা কালী। 'সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা !' বিশ্বোপলব্ধির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ কাব্যের ছন্দ খুঁজে পেলেন, 'রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী। উষ্ণধার, রুধির-উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী ॥' সত্য আবিষ্কার করলেন নরেন্দ্রনাথ, 'সত্য তুমি মৃত্যুরূপা-কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।'

মন্ত্রদানকারী, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের মিলিতরূপ গুরু নয় এলেন নরদেব। ভববৈদ্যং, সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক। পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ গাজীপুর থেকে বেনারসের প্রমদাবাবুকে লিখলেন—বৈরাগ্য কোথায় পাব ! সেই বৈরাগ্যের চেষ্টায় ভবঘুরেগিরি করছি।

গোটা ভারতের বিভিন্ন ধরনের জীবনচিত্র দেখে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, 'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম'। তিনি দীনের বন্ধু ছিলেন। বলেছিলেন, 'নরেন ! খালিপেটে ধর্ম হয় না'। মানুষকে গুরুর ছবি, লকেট, জপের মন্ত্র না দিয়ে, আগে পেট ভরে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও, মাথায় একটা আশ্রয় দাও, পরনের কাপড় দাও, আত্মসাৎ-কারী, স্বার্থপর, আত্মম্ভর, পিশাচরূপী বড়লোকগুলোকে মানুষ করার চেষ্টা কর। এ দেশের সমাজ-শরীরের ব্যাধি উত্তম বৈদ্যের চোখে দর্শন করে ধর্মের মধ্যে থেকে নিরাময়ের ব্যবস্থা করো। জীবের মধ্যে শিবের প্রতিষ্ঠাই তোমার ধর্ম, তোমার সাধনা ! কাজ, কাজ, কাজ করতে করতে মরে যা।

নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হলেন স্বামী বিবেকানন্দে। রোমাঁরোঁলা লিখলেন, the spirit withe the widest wiugs-Vivekananda···He was energy personified, and action was his message to men. For him, as far Beethoven, it was the root of all the virtues. জ্ঞান-ভক্তির মহাতরঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ। মঠ, মিশন, মূর্তি নয়, তাঁর খেলার সাথী হও। মুখে নয় কর্মে ! কার্যে পরিণত কর—জগৎ দেখুক। জগৎ দেখছে, স্বামী বিবেকানন্দ সেই মানুষ যাঁর মধ্যে সর্বকালের সব মানুষের মিলন মেলা। সেইটিই জপের মালা।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব ॥

শ্যামপুকুর বাটীতে সকাল। কলকাতার শীতের সকাল যেমন হয়। ঘিঞ্জি এলাকা। গায়ে গায়ে বাড়ি। খোলা উনুনের ধোঁয়া ভারী বাতাসের সঙ্গে জড়িয়ে আচ্ছাদনীর মতো ঝুলে আছে। ম্যাটম্যাটে রোদ। পল্লীর জেগে ওঠার মিলিতমিশ্রিত যাবতীয় শব্দ। বারান্দায় কাকের কর্কশ চিৎকার। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় উঠে বসেছেন। কণ্ঠক্ষতের চিকিৎসার জন্য ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামপুকুর বাটীতে এসে উঠেছেন। বাড়ির মালিক গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য। ঠিকানা ৫৫, শ্যামপুকুর স্ট্রীট। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তরাই বাড়িটি ঠিক করেছেন।

শ্যামপুকুর স্ট্রীট শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত। এই রাস্তায় তাঁর অনেক ভক্ত থাকেন, নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, ঠাকুর যাঁকে কাপ্তেন বলে সম্বোধন করেন। প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরের মোটা বামুন। কালীপদ ঘোষ, গিরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ, ঠাকুরের বিশেষ কৃপাধন্য। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে 'দানা' বলে ডাকেন, সেইজন্য রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে তিনি 'দানাকালী'। সুগায়ক, বেহালা এবং বংশীবাদক। এঁর বাঁশী শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এই ভাড়াবাড়ির দেখাশোনা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার, সাজানো-গোছানোর যাবতীয় দায়িত্ব দানাকালীর। অদূরেই তাঁর বাড়ি, ২০, শ্যামপুকুর লেন। এই সব ভক্তদের বাড়িতে ঠাকুর একাধিক-বার এসেছেন।

ঠাকুর তাকিয়ে আছেন দেয়ালে টাঙানো নানা ছবির মধ্যে বিশেষ একটি ছবির দিকে—যশোদা ও বালগোপাল। পাশেই আর একটি ছবি—মনোরম সংকীর্তনের দৃশ্য। যেদিন বলরামবাবুর বাড়ি ছেড়ে সন্ধ্যার সময় এই বাড়িতে এলেন, শুক্রবার, ২ অক্টোবর ১৮৮৫, সেদিন ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত লণ্ঠন তুলে তুলে ছবি দেখাচ্ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন বাদুড়বাগানের নবগোপাল ঘোষ। তিনি বলেছিলেন, 'ছবিতে আপনি আপনাকেই দেখছেন।' নবগোপাল ঠাকুরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেছিলেন। ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছেন ঠাকুর। বাদুড়বাগানের স্মৃতি ভেসে আসছে। নবগোপালের বাড়ির উঠোনে সে কী নৃত্যগীত! ঠাকুর তাকিয়ে আছেন, ভাবছেন, কোথায় দক্ষিণেশ্বর আর কোথায় উদ্যানবাটীর পরিবর্ত এই

শ্যামপুকুর বাটি ! শীত শীত, ভিজে ভিজে বদ্ধ একটা পরিবেশ ! ভাবছেন সারদার জীবনে মা সাংসারিক শান্তি আর দিলেন না ! ওই তো ছাতে ওঠার সিঁড়ি, ছাতের দরজার পাশে চারহাত মতো আচ্ছাদিত চাতাল, সেইখানে ভোর তিনটে থেকে রাত এগারোটা। রাত দুটোয় উঠে স্নান, শৌচ সারে ; কারণ একটি মাত্র শৌচালয়। ভক্ত সেবক অনেক। ঠাকুর সকালে আহার করেন, ভাতের মণ্ড, ঝোল আর দুধ। সন্ধ্যায় দুধ আর যবের মণ্ড। সবই তরল। মা সারাদিন ওই জায়গাটিতে বসে এইসব পথ্য তৈরি করেন। অবসরে ধ্যান-জপ। সাহায্য করেন ভক্তিমতী সেবিকা গোলাপ-মা। দোতলার পশ্চিম প্রান্তে ছোট্ট একটি ঘর মায়ের জন্য নির্দিষ্ট আছে। সেই ঘরে আসতে আসতে রাত এগারটা। এত ভক্তের আসা-যাওয়া, ডাক্তার-বদ্যি। কেউ জানেন না—মা কোথায় ! তিনি অন্তরীক্ষে।

বেলা বাড়ল। গলার ক্ষতও বাড়ছে। মাঝে হোমিওপ্যাথিক ওষুধে কিছু ভাল ফল পাওয়া গিয়েছিল। কলকাতার বিশিষ্ট কবিরাজবৃন্দ, গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল আগেই রোগপরীক্ষা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কবিরাজীশাস্ত্রে এই ব্যাধির নাম রোহিণী, অর্থাৎ ক্যানসার। দুশ্চিকিৎস্য। এখন দেখছেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি ঠাকুরের নাড়ি পরীক্ষা করছেন। হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'বাড়ল কেন ? কাল আবার রক্ত পড়েছে ? তাহলে ক্ষত ক্রমশই বাড়ছে। ওষুধটা ধরেও ধরল না। মনে হয় খাওয়ার কোনও অনিয়ম হয়েছে। ঝোল খাও ?'

ঠাকুর বললেন, 'ওই যতটুকু গলা দিয়ে নামে !'

'আচ্ছা বল তো, ঝোলে কি কি আনাজ পড়ছে ?'

'ওই তো, আলু, কাঁচকলা, বেগুন, দু'এক টুকরো ফুলকপি !'

ডাক্তার সরকার আঁতকে উঠলেন, 'অ্যাঁ—ফুলকপি খেয়েছ ? ঠিক ধরেছি, খাওয়ার অত্যাচার। ফুলকপি বিষম গরম, দুষ্পাচ্য ! ক টুকরো খেয়েছ ?'

ঠাকুর অপরাধী বালকের মতো মুখ করে বললেন, 'একটুকরোও তো খাইনি, তবে ঝোলে ছিল !'

ডাক্তার বললেন, 'খাও আর নাই খাও, ঝোলে ওর সত্ত্ব তো ছিল —সেই জন্যেই তোমার হজমের ব্যাঘাত হল, ব্যারামটা হঠাৎ বেড়ে গেল !'

ঠাকুর আশ্চর্য হয়ে বললেন 'সে কি গো! কপি খেলুম না, পেটের অসুখও হল না, ঝোলে সামান্য একটু কপির রসের জন্য ব্যারাম বেড়ে গেল! অবাক কথা। মানতে পারছি না!'

ডাক্তার বললেন, ওই একটুতেই যে কত অপকার করতে পারে, তোমার ধারণা নেই। আমার জীবনের একটা ঘটনা তাহলে শোনো। শুনলে বুঝতে পারবে। আমার হজমশক্তিটা বরাবরই কম; মাঝে মাঝে অজীর্ণে ভুগতে হত; সেইজন্যে খাদ্য সম্পর্কে আমি খুব সতর্ক। একটা নিয়ম মেনে চলি। দোকানের কোন জিনিস খাই না। ঘি, তেল পর্যন্ত বাড়িতে করিয়ে নি। তবু একবার খুব সর্দি থেকে ব্রন্‌কাইটিস হয়ে গেল। কিছুতেই সারতে চায় না। তখন মনে হল, নিশ্চিত খাবারে কোনো দোষ হচ্ছে। সন্ধান করে কোনো দোষই খুঁজে পেলুম না। তারপর হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল, যে-গরুটার দুধ খাই, সেই গরুটাকে কাজের লোক কতকগুলো মাষ-কড়াই খাওয়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলুম, কোথা থেকে কয়েক মণ ওই কড়াই পাওয়া গিয়েছিল, সর্দির ভয়ে কেউ খেতে চায় না বলে কিছুদিন ধরে গরুকে খাওয়ান হচ্ছে। তখন দিন হিসেব করে পেলুম, যবে থেকে গরু মাষকড়াই খাচ্ছে, প্রায় সেই সময় থেকেই আমাকে সর্দিতে ধরেছে। বন্ধ কর, বন্ধ কর। কড়াই খাওয়ানো বন্ধ করার কয়েকদিন পরেই আমার সর্দি কমতে লাগল। অনেকদিন ভুগলুম। বায়ু পরিবর্তনে হাজার পাঁচেক গেল! কি থেকে কি হয় বুঝলে তো!'

ঠাকুর খুব আনন্দ পেয়েছেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ও বাবা, এ যে দেখছি ওই তেঁতুলতলা দিয়ে গিয়েছিল বলে অম্বল হল, প্রায় সেই রকম।'

ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই হাসছেন। বোঝার উপায় নেই অসুখ না উৎসব! ওই যেমন বলে দিয়েছেন, রোগ জানুক আর দেহ জানুক। থাক শালার দেহ একা পড়ে। মন তুই পালিয়ে আয়, ভ্রমরের মতো মজে থাক শ্যামাপদ নীলকমলে। যেমন বলেছিলেন, 'থাক্ শালার 'আমি' দাস 'আমি' হয়ে।'

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন, 'শুধু ওষুধ নয়, ওষুধ, পথ্য, পরিবেশ—ট্রিনিটি। পরিবেশ পালটাতে হবে। এখানে চিকিৎসা হবে না। খোলামেলা, আলোঝলমলে, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ চাই। দক্ষিণেশ্বরে যাঁর এত বছর কেটেছে, তাঁর পক্ষে এই জায়গা

আরোগ্যের প্রতিকূল। হবে না। দিস প্লেস ইজ অ্যানসুটেবল! একটা বাগান বাড়ির চেষ্টা করো!' কথা শেষ করে ঠাকুরের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাসি হাসি মুখে বললেন, 'বেশ আছ পরমহংস! রোগ জানুক আর দেহ জানুক! এদিকে ভেবে ভেবে আমাদের রাতের ঘুম চলে গেল। শোনো, তুমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছ। শরীরে রক্ত কমে গেছে। খাবো না বললে হবে না, তোমাকে কচি পাঁঠার সুরুয়া খেতে হবে। আমি এখন যাচ্ছি, আবার আসব। তোমার প্রেমে পড়ে গেছি পরমহংস। মহেন্দ্র সরকারের এই রকম কখনো হয়নি!'

সুপুরুষ সায়েবি মেজাজের কট্টর যুক্তিবাদী ডাক্তার সরকার চলে গেলেন। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তরল পথ্য একটু একটু করে খাইয়ে দিচ্ছিলেন। গিলতে পারছেন না। অতি কষ্টে একটু। কপালে ঘাম ফুটে গেছে। ডাক্তার একদৃষ্টে দেখছিলেন। তাঁর মতো কঠিন মানুষের মুখেও বেদনার ছায়া।

তিনি চলে যাওয়ার পর নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ডাক্তার খুব লোক!'

ঠাকুর বললেন, 'খু-উব।'

গৃহী ভক্ত, মুরুব্বি মানুষ, রামচন্দ্র দত্ত মশাই এতক্ষণ দূরে বসেছিলেন, কাছে সরে এসে বললেন, 'ডাক্তার সরকার তো বলে গেলেন. এবার তাহলে আপনার জন্যে কলকাতার বাইরে একটা বাগানবাড়ি দেখি?'

ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, এখানে হজম খিদে কিচ্ছু হচ্ছে না।'

রামবাবু মনে মনে ভাবছেন, শুধু বাড়ি নয়, বাগানবাড়ি। এমন বাড়ি কোথায় মিলবে!

বাগানবাড়ির মালিকরা অবশ্যই বড়লোক! শখের বাগানবাড়ি কোন দুঃখে ভাড়া দিতে যাবে! রাম দত্ত মশাই হাত জোড় করে ঠাকুরকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ্ঞে, বাড়ি কোন্ অঞ্চলে অনুসন্ধান করব?'

ঠাকুর ঈষৎ হেসে বললেন, 'আমি কি জানি? সে তো তোমরাই জানবে!'

রামবাবু মনে মনে বললেন, 'প্রভু! আমাদের সঙ্গে এখনও আপনার এই ভাব! বলে দিন কোন্ দিকে যাব। সব জানেন আপনি। অনর্থক ঘুরিয়ে মারবেন না। প্রকাশ্যে যা বললেন,

কাশীপুর, কি বরাহনগর অঞ্চলে চেষ্টা করব ?

ঠাকুর ইঙ্গিতে জানালেন, করো।

অঘ্রাণ শেষ হতে চলল, যা করার এই মাসেই করতে হবে। পৌষে ঠাকুর বাড়ি বদলাতে চাইবেন না। ঠাকুরের আর এক পরম ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তী ছোটখাটো জমিদার। কাশীপুরে তাঁর বাড়ি। বেদান্তবাদী। বড় মজার মানুষ। নিজেকে অতিরিক্ত জাহির করার দোষে হাস্যাস্পদ হতেন পদে পদে।

ছেলের নাম রেখেছেন মৃগাঙ্ক-মৌলি পুততুণ্ডী। বাড়িতে একটা হরিণ আছে, তার নাম, কপিঞ্জল। তাঁর দীক্ষাগুরুর নাম, আগমাচার্য ডমরুবল্লভ। তিনি একতারা বাজিয়ে প্রণবোচ্চারণ, ওঁ ওঁ করেন, মাঝে মাঝে হুঙ্কারধ্বনি। কুলকুণ্ডলিনী জাগছে। বাড়িতে প্রতিষ্ঠিতা দেবী শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা। ৺জগদ্ধাত্রী পূজাও হত। তিনি একটি ঘোড়ায় টানা গাড়িতে, যাকে ইংলণ্ডে বলে 'বগি' চেপে যাতায়াত করতেন। সেই সময় অনবরত চিৎকার করতেন, 'তারা তত্ত্বমসি ত্বমসি তৎ।' তাঁর একটি বাঘছাল ছিল। সেইটি পঞ্চবটীতে বিছিয়ে গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিয়ে, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে, হাতে একতারা নিয়ে সাড়ম্বরে সাধনায় বসতেন। সুন্দরকান্তি বিশাল বপু, চোখে না পড়ে উপায় নেই। সাধন শেষে ব্যাঘ্রাজিনটি ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে চলে যেতেন। ঠাকুর তাঁকে এক আঁচড়েই চিনে ফেলেছিলেন। কারণ, 'ওই বাঘের ছালটা কার', একদিন ঠাকুরের এক অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওটা মহিম চক্রবর্তীর। রেখে গেছে, কেন জান ? লোকে দেখে জিজ্ঞেস করবে, 'ওটা কার ?' তখন আমি তার নাম করলে ধারণা হবে, মহিম চক্রবর্তী এক মস্ত সাধক।'

রাম দত্ত মশাই এই মহিমবাবুর যোগাযোগে কাশীপুরে মতি-ঝিলের উত্তরে কাশীপুর রোডের ওপরে রানী কাত্যায়নীর জামাই গোপালচন্দ্র ঘোষের বাগানবাড়িটি ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় পেয়ে গেলেন। এগার বিঘা চারকাঠার কিছু বেশি জমির ওপর এই উদ্যানবাটী। দুটি পুকুর। উত্তর-পূর্ব ধারেরটি বিশাল। স্বচ্ছ টলটলে জল। প্রশস্ত শান বাঁধানো ঘাট। পশ্চিমেরটি একটু ছোট। দুটি পুকুরের মাঝে প্রায় গোলাকার ইট বাঁধান পথ। অতি সুন্দর উদ্যানঘেরা দোতলা একটি বাড়ি। নিচে চারখানি, ওপরে দুখানি

ঘর। দোতলায় রেলিংঘেরা স্বল্প পরিসর সুন্দর একটি ছাত। দোতলায় ওঠার ঝকঝকে কাঠের সিঁড়ি।

প্রথমে ঠাকুর আঁতকে উঠেছিলেন, 'বলো কি? মাসে আশি টাকা! আমার জন্যে আশি টাকার বাড়িতে কাজ নেই বাপু! যা থাকে বরাতে, দক্ষিণেশ্বরেই বরং ফিরে যাই!' শ্যামপুকুরে অবস্থানের আজ শেষদিন। ১০ ডিসেম্বর, ১৮৮৫। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্যামপুকুর লীলার এই শেষ সন্ধ্যা। ঘরে ঠাকুরের প্রবীণ ভক্তদের অনেকেই ছিলেন। তাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, টাকার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। ঠাকুর বললেন, 'একটি শর্তে আমি যেতে পারি, যদি ওই আশি টাকার ভাড়ার পূর্ণ দায়িত্ব সুরেন্দ্র নেয়।'

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ভস্ট কোম্পানির মুৎসুদ্দি। সিমুলিয়ায় বাড়ি। ধনী মানুষ। ঠাকুরের পরম ভক্ত। তিনিই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি 'গুরু' রূপে বরণ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে রাজি। তিনি অঙ্গীকারপত্র সই করে দিলেন। আপাতত ছমাসের জন্যে বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হল। সুরেন্দ্রনাথকে কাছে ডেকে ঠাকুর ফিসফিস করে বললেন, 'দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরানী-মেরানী ছাপোষা লোক, এরা এত টাকা চাঁদা তুলতে পারবে কেন, এ বেশ ভাল হল। তুমি দায়িত্ব নিলে। দেখ সুরন্দর, থাকাই বলো আর খাওয়াই বলো, চাঁদা করে হচ্ছে শুনলে আমি আঁতকে উঠি। কখনো অমন ব্যবস্থায় মা আমাকে ফেলেননি। তবে দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়িতে মথুর চলে যাওয়ার পর অনেকটা চাঁদার মতোই হল বটে। জমিদারি নানা-শরিকে টুকরো হল। মন্দিরের মায়ের সেবার পালা পড়তে লাগল। কিন্তু ওই চাঁদা ব্যবস্থায় আমি ঠিক ঠিক পড়িনি। রাসমণির বন্দোবস্তে আমার জন্যে মাসকবারি সাতটাকা বন্দোবস্ত আছে, আর যতদিন থাকব মায়ের মন্দিরের প্রসাদ আমাকে দেওয়া হবে। এটাকে তুমি পেন্সান বলতে পার। তাই শ্যামপুকুরে আসার সময় বলরামকে ডেকে বলেছিলুম, তুমি আমার খাবার খরচা দেবে। চাঁদায় আমি খেতে পারব না।'

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ও-সব আপনি একদম ভাববেন না। ভাবনা আমাদের। আপনার কাজ তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠা।'

গিরিশচন্দ্র একপাশে নীরবে বসে ছিলেন। তিনি সহসা বললেন, 'আপনি মাঝে মাঝে কি যে দেখান! আমি কি বুঝতে পারছি না

ভাবছেন! আপনি ইচ্ছা করলেই রোগ সেরে যায়—আর আমি ভুলছি না।' ঠাকুর তাকালেন, হাসলেন। গিরিশবাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। থিয়েটার আছে।

ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে বললেন, 'বিশ্বাসটা একবার দেখেছো!'

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অদ্ভুত পরিবর্তন। তিনি বসে আছেন। মনে মনে স্তবপাঠ করছেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে ডাক্তারকে দেখিয়ে মৃদুমৃদু হাসছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরম ভক্ত। উপাধি মজুমদার। গীতিকার। সুন্দর গান রচনা করেন। ঠাকুর এইবার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু ভাল দেখছো?'

ডাক্তার সরকার বললেন, 'বলতে ভয় হয়—এখুনি হয়তো কিছু রোগ দেখাবেন।'

ঠাকুর আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। ভাল থাকলেও একজন জানেন সময় আসন্ন। তিনি, শ্রীশ্রীমা। তিনতলার চাতালে পথ্য তৈরিতে ব্যস্ত। সমস্ত ইঙ্গিতে মিলে যাচ্ছে। ঠাকুর বলেছিলেন, 'সারদা! যখন দেখবে, আমি যার তার হাতে খাচ্ছি, কলকাতায় রাত্রিবাস করছি, নিজের খাবারের অগ্রভাগ অপরকে দিয়ে খাচ্ছি, আর যখন দেখবে অধিক লোক একে দেবজ্ঞানে মানছে, শ্রদ্ধাভক্তি করছে তখন জানবে এর অন্তর্ধানের সময় হয়ে এসেছে।' সব মিলে যাচ্ছে।

॥ দুই ॥

১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫। শীতের কলকাতা। কদিন পরেই বড়দিন, সাহেবপাড়া, নেটিব ক্রিশ্চান পাড়ায় সাজো সাজো রব। জাঁকালো শীত। কমলালেবুর মতো রোদ। বেলা তিনটে নাগাদ শ্যামপুকুর স্ট্রীট থেকে দুটো ঘোড়ার গাড়ি বেরলো। প্রথমটিতে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ। দ্বিতীয়টিতে শ্রীশ্রীমা, মায়ের সঙ্গী ও জিনিসপত্র। ঠাকুর একবার ফিরে তাকিয়ে দেখে নিলেন, ওই বাড়ি, ওই বারান্দা! আর না, আর না, সত্তর দিনের স্মৃতি পড়ে রইল ইতিহাসে।

গাড়ি চলেছে দুলকি চালে, ঘোড়ার গাড়ির যেমন চলা উচিত। এই পথে ঠাকুর সপার্ষদ কতবার আসা যাওয়া করেছেন এই মাস কয়েক আগে। সুস্থ, সবল। আনন্দে, উল্লাসে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ। সারা কলকাতাকে যিনি আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উদ্বেল করতেন, তিনি

আজ শরীরে বড়ই দুর্বল। চলতে ফিরতে কাঁপেন। গত তিন চার মাস শরীর অতি সামান্যই খাদ্য গ্রহণ করতে পেরেছে! দেহ যত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে মুখমণ্ডল তত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর! ঠাকুর এদিকে, ওদিকে তাকিয়ে দেখছেন। এই তো গিরিশের পাড়া! ওই তো বলরামের বাড়ি। ওই তো ওই দিকটায় পশুপতি বোসের বাড়ি। শীতের দুপুর অপরাহ্নে ঠেকেছে। দোকান-পাট রাস্তাঘাট রোদের আকর্ষণে জমজমাট। ওই তো ওই বিবিবাজারের সেই দিশী মদের দোকানটি। একদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতা আসার পথে এই দোকানের সামনে কয়েকজন মানুষের মত্ততা দেখে ঠাকুর চলন্ত গাড়িতে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, একটি পা পাদানিতে, উল্লাসে চিৎকার করছেন, 'চালাও, চালাও, চালিয়ে যাও!' যেভাবেই হোক, যে পথেই হোক দেহাতীত আনন্দে চলে যাও। এই জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বর স্বয়ং সচ্চিদানন্দ। বাঁ দিকের রাস্তাটি ঢুকে গেছে গঙ্গার দিকে। ওখানে আছেন মা চিত্তেশ্বরী, মা সর্বমঙ্গলা। ইতিহাসের পথ ধরে চলেছে আর দুটি ঐতিহাসিক গাড়ি। প্রথমটিতে লীলাময় ভগবান, দ্বিতীয়টিতে লীলাময়ী ভগবতী। মানবলীলায় মেতেছেন। পেছনের বগিতে মাতৃমূর্তি সারদা। ভবিষ্যৎ তিনি জেনে ফেলেছেন, তাই স্থির, প্রশান্ত অতি।

উদ্যানবাটীর লোহার ফটক পেরিয়ে গাড়ি প্রবেশ করছে। ক্যালেণ্ডারে ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫, শুক্রবার। অস্তাচলে সূর্য। পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদ আকাশে ওঠার সাজঘরে। প্রবেশমাত্রই ঠাকুর মহানন্দে বললেন, 'বাঃ, বাঃ এই তো বেশ, এই তো বেশ।' ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দে দ্বিতীয় গাড়িটি থামল। ঠাকুরকে সাবধানে উত্তরণ করান হল। সকলেই সাবধান। সুকোমল দেহের কোথাও যেন ধাতব আঘাত না লাগে। তিনি উত্তীর্ণ হয়ে উদ্যান নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরের মতো না হলেও, এ বেশ!' হঠাৎ দুর্বল শরীর ভয়ঙ্কর সবল। এখন দেহ নয়, হাঁটছে মন। তরতর করে এগোচ্ছেন। পেছনে লোহার গেট ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে লৌহময় শব্দে। অস্তাচলে সূর্য। বন্ধ হয়ে রইল আটটি মাসের গাঢ় গূঢ় ভবিষ্যৎ, যুগান্তকারী উপাদানের সাজঘর! বসে গেল একটি অদৃশ্য সুউচ্চ 'ট্র্যানসমিশান টাওয়ার', 'শ্রীরামকৃষ্ণ মহাভাব তরঙ্গের', যা পরবর্তীকালে হবে বেলুড়মঠের চূড়া।

সবাই এগোচ্ছেন উদ্যানমধ্যস্থ বাড়িটির দিকে। নিচে চারখানি

ঘর। মাঝের ঘরটিকে হলঘর বলা চলে। ঠাকুর সপার্ষদ হলঘরে এসে বললেন, 'বাঃ বাঃ!' সকলে তাঁকে চালিত করলেন দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ির দিকে। ঝকঝকে পালিশ। অতি মসৃণ! সবাই সাবধান। ধাপগুলি সামান্য উঁচু। ধীরে উঠছেন ঠাকুর। আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি। এখানে মায়ের আর কোনো ভূমিকা নেই, ভক্তদের সেবায় শ্রীভগবান।

দোতলায় তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে ঠাকুর আরও খুশি। বেশ প্রশস্ত। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ, তিনটি দিকই খোলা। পশ্চিমের দেয়াল অর্ধগোলাকার। ছাদ অনেক উঁচুতে। দক্ষিণে রেলিংঘেরা স্বল্প পরিসর ছাদ। ঠাকুর দ্রুতপদে সেই ছাদটির দিকে এগিয়ে গেলেন। চারপাশে উদ্যানের অপূর্ব শোভা অদূরে মতিঝিল। ঝিলের পশ্চিমে মতিলাল শীলের মনোরম বাগানবাড়ি। অদূরে, কিছু উত্তরে রানী কাত্যায়নীর গোপাল মন্দির। ঠাকুর বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সব দেখছেন শীতের পড়ন্ত বেলার আলোয়। 'ভারি খুশী হৈলা রায় দেখিয়া বাগান'। যাঁরা জানার তাঁরা জানেন, উদ্যানবাটীর দোতলার 'হেড কোয়ার্টারে' কোন্ আণবিক বোমা তৈরি হবে। ঠাকুরের এই আরোহণ দোতলায় নয়, ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ মহল থেকে খবর এল, কয়েকজন মিষ্টান্নাদি নিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছেন। যেই শুনলেন ঠাকুর নেই, চিকিৎসার জন্য কাশীপুরে, তখন তাঁরা ঠাকুরের ছবির সামনেই ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। শ্রীমার মনটা কেমন হয়ে গেল! আশঙ্কা, আতঙ্ক! এতে তো ঠাকুরেরই অকল্যাণ হল। ঠাকুরকে বললেন। তিনি সব শুনে বললেন, 'ওরা মা কালীকে ভোগ নিবেদন না করে ছবিকে কেন দিলে?' পরমুহূর্তেই অভয় দান করে বললেন, 'ওগো! তোমরা কিছু ভেব না—এর পর ঘরে ঘরে আমার পুজো হবে। মাইরি বলছি—বাপান্ত দিব্যি।' মা শুনে চলে গেলেন, 'বুঝেছি বুঝেছি। তোমার খেলা। তুমি তার বাঁধছ! দোতারা! গৃহী আর সন্ন্যাসী!'

নেতা নরেন্দ্রনাথ। তখন তাঁর সব গেছে। পিতা পরলোকে। উত্তরাধিকার, ঋণের বোঝা। জাতি-শত্রুরা নরেন্দ্রনাথের পরিবারকে বাড়ি ছাড়া করেছে। নরেন্দ্র-জননী ভাই-বোনদের নিয়ে মাতামহী ভবনে কোনো রকমে আছেন। আদালতে মামলা চলছে। সামনেই

তাঁর আইন পরীক্ষা। ইচ্ছে করলে নরেন্দ্রনাথ একজন নামকরা উকিল হতে পারতেন। একদিন এজলাসে মামলার শুনানি হচ্ছে। পিতা বিশ্বনাথের দুই বন্ধু নিমাইচন্দ্র বসু ও ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি নরেন্দ্রনাথদের পক্ষে মামলা পরিচালনার ভার নিয়েছেন। অপরপক্ষ পয়সার জোরে এক ইংরেজ ব্যারিস্টার নিয়োগ করেছেন। সেদিন ইংরেজ ব্যারিস্টার ঠিক করেছেন নরেন্দ্রনাথকে জেরার সময় আদালতে এই প্রতিপন্ন করবেন, 'যুবক একগুঁয়ে, রামকৃষ্ণের খেয়ালী ছোকরা—নট নরম্যাল, বাট অ্যাবনরম্যাল'। জজ সাহেব শুনছেন। ব্যারিস্টার বলছেন, অ্যাবসলিউটলি অ্যারোগ্যাণ্ট, হুইমজিকাল। হি ইজ এ রামকৃষ্ণ-চেলা। কান ইউ ডিনাই?' নরেন্দ্রনাথ এতটুকু ঘাবড়ালেন না। সংক্ষিপ্ত একটি পালটা প্রশ্ন করলেন, "মহাশয়, আপনি 'চেলা' শব্দটির অর্থ জানেন কি।"

সায়েব জানেন না। জেরা গোলমাল। সায়েব 'ল্যাজে-গোবরে।' ইংরেজ বিচারকের সপ্রশংস উক্তি, 'যুবক, তুমি একজন ভাল উকিল হবে।' ইংরেজ ব্যারিস্টার এজলাসের বাইরে এসে নরেন্দ্রনাথের করমর্দন করে বললেন, 'আমি জজ সাহেবের সঙ্গে একমত, আইন-ব্যবসাই তোমার উপযুক্ত ক্ষেত্র। আমি তোমার মঙ্গলকামনা করি।'

চুলোয় যাক সব, আইন আদালত, পরীক্ষা। আমরা 'রামকৃষ্ণের চেলা'। চলে আয় তোরাও। উদ্যানবাটী আমাদের সাধনক্ষেত্র। তাকিয়ে দেখ দোতলার ওই ঘরটির দিকে। খড়খড়ির জানলার পাখি ভেদ করে বেরিয়ে আসছে আলোর সমান্তরাল রেখা। ওখানে মশারির ভেতর বসে আছেন ক্যানসারের ক্ষত নিয়ে মন্দিরের ভগবান নন, মানুষের ভগবান। স্বপ্নে, দক্ষিণেশ্বরের মা কালী এসেছিলেন। একপাশে তাঁর ঘাড়টি কাত। উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মা! তোমার কি হয়েছে!' তিনি বললেন, 'তোর যা হয়েছে!' মনে আছে তাঁর ওই গল্প—গার্ডসাহেবের, চৌকিদারের লণ্ঠন। সেই আলোর ফোকাসে অন্যের মুখ দেখা যায়। যাঁর আলো তাঁর মুখ দেখা যায় না। ওই সেই আলো। ওই আলোয় তিনি আমাদের মুখ দেখছেন, গৃহীদের মুখ দেখছেন। মায়ের কাছে যাঁরা আছেন সেই রমণীদের মুখ দেখছেন। চিরকালের পৃথিবীতে মানুষের তো তিন স্তর। এই উদ্যানবাটী সেই পৃথিবীরই একটি ল্যাবরেটরির সংস্করণ হতে চলেছে। ফেলে দে হুঁকো, গুটিয়ে ফেল সতরঞ্জি, পরে নে কৌপিন। সেবা আর সাধনা এক

হয়ে যাক।

নীচের হলঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বড় ঘরটি সেবক-ভক্তদের বাসস্থান। নরেন্দ্রনাথ নাম রেখেছেন 'দানাদের ঘর'। নরেন্দ্রনাথের কথায় সবাই উঠে পড়লেন। যাঁদের তন্দ্রামতো এসেছিল তাঁদের ঠেলে তোলা হল। সদলে বেরিয়ে এলেন বাগানে। শীতের গভীর রাত। ঠাণ্ডা যেন কামড়াতে আসছে। নিথর-নিস্তব্ধ চারপাশ। পৃথিবী যেন ধ্যানমগ্ন। পায়চারি করতে করতে গভীর গম্ভীর গলায় নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'দেহরক্ষার সংকল্পই হয় তো করেছেন। এইবেলা যে যত সেবা আর সাধন ভজন করে নিতে পারিস করে নে।'

কয়েকদিন আগে বাগান পরিষ্কার করা হয়েছে। একপাশে শুকনো ডালপালার একটা স্তূপ। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'দে এতে আগুন ধরিয়ে।' হাতে হুঁকোটি তখনো ধরা ছিল তাঁর। কয়েক টুকরো আগুন ফেলতেই দপ্ করে সব ধরে গেল। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'চারপাশে সব গোল হয়ে বোস। এই আমাদের ধুনি। সাধুরা গভীর রাতে এই রকম ধুনি জ্বালিয়ে সাধনভজন করেন। ফেল এই আগুনে ফেলে দে যত সুপ্ত কামনা বাসনা। সাধুর সম্বল তীব্র বৈরাগ্য, বিশুদ্ধ জ্ঞান আর প্রেম।' সারাটা রাত কোথা দিয়ে চলে গেল।

ঠাকুরও উঠে দাঁড়ালেন শয্যা ছেড়ে। পশ্চিমের ঝলমলে রোদ প্রজাপতির মতো ঘরে ভাসছে। আজ আমি অনেক সুস্থ। আজ পয়লা জানুয়ারি। ১৮৮৬। আমাকে সাজিয়ে দে। আজ আমি বাগানে নামবো। ছুটির দিন। ভক্ত সমাগমে উদ্যান আজ প্রাণোচ্ছল। বসে আছেন সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ন্ত রোদে। অনেকে বেড়াচ্ছেন জুটি বেঁধে। দানাদের ঘরে নরেন্দ্রাদি সন্ন্যাসীসম ভক্তরা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি দূর করছেন।

বাহির উদ্যানের ভক্তরা হঠাৎ অবাক হয়ে দেখছেন, এ কী! ঠাকুর আসছেন। স্বয়ং ঠাকুর এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। অপূর্ব সাজ। সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত। মাথায় সবুজ বনাতের কান-ঢাকা টুপি। মুখে অলৌকিক, অপূর্ব এক জ্যোতিঃ। নিচের হলে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা ঠাকুরকে অনুসরণ করলেন। পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাগানে নেমে দক্ষিণদিকের ফটকের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। উদ্যান। রোদ, ছায়া, উত্তুরে বাতাস। পশ্চিম

বৃক্ষতলে বসে আছেন গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, অতুলচন্দ্র।

তাঁরা প্রণাম করতে করতে এগিয়ে এলেন। ঠাকুর তখন সরাসরি গিরিশচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন, 'গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ, তুমি কি বুঝেছ?'

বিশ্বাসে অটল গিরিশচন্দ্র সরাসরি এই প্রশ্নে এতটুকু বিচলিত হলেন। তিনি পদপ্রান্তে নতজানু। জোড়হস্ত। ঊর্ধ্বমুখ। রুদ্ধ কণ্ঠে প্রখ্যাত নট-নাট্যকার বললেন, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক কি আর বলতে পারি।'

ঠাকুর ঘুরে দাঁড়ালেন। উদ্ভাসিত রূপ। এ পর্যন্ত কেউ দেখেনি ও রূপ। কোথায় অসুখ। জ্যোতির্ময়। সামনে ভক্তবৃন্দ। ঠাকুর তখন বললেন, 'তোমাদের কি আর বলব আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।' সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন ভাবের ঘরে। উদ্যান ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত স্থির যেন এক কল্পতরু। হুড়োহুড়ি লেগে গেল। প্রণামের পর প্রণাম! ক্রন্দন। প্রবাদোক্ত কল্পতরুর কাছে চাইতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরুর অযাচিত কৃপা—নাও চৈতন্য, জ্ঞান, আনন্দ। ভবযন্ত্রণা দূরের অব্যর্থ ঔষধ—শ্রীরামকৃষ্ণকৃপা। যেমন তিনি নেমেছিলেন, দিনশেষে ঠিক সেইভাবেই উঠে গেলেন ওপরে, আরও ওপরে, আর নামলেন না কোনোদিন। সাতমাস পরে উদ্যানবাটীর ফটক খুলে তিনি বেরিয়ে এলেন ত্রিধারায়—সৎগৃহী হয়ে, বিশ্ব কাঁপানো বীর সন্ন্যাসী হয়ে আর পৃথিবীর মতো সহিষ্ণু মাতা হয়ে।

আর জজসাহেব বলেছিলেন, যুবক তুমি ভাল উকিল হবে। হয়েছেন। বিশ্ব আদালতের। সব কারাগার খুলে দিয়েছেন একটি Verdict-এ—পাপও নেই পুণ্যও নেই আছে মানুষ। যত মানুষ তত স্বভাব। বিবেকই ধর্ম। জাগাতে চাও! চলে যাও—তিনি চিরপ্রতিষ্ঠিত—'শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাকল্পতরু'। চলে যাও জগতের জননী সারদার কাছে—তিনি সতেরও মা, অসতেরও মা।